সেকেলে ডাকাতের নীতি

শেখর বসু

অনন্যা আঁতকে উঠে বলল, ‘সেকালের ডাকাতরা কিন্তু এত খারাপ ছিল না।’

উদয়ন হেসে উঠেছিল। ‘ডাকাতদের আবার সেকাল-একাল কী? চোর-গুণ্ডা-ডাকাতদের চরিত্র চিরকালই একরকম।’

এযার চোখেমুখে মৃদু আতঙ্ক আর বেদনার ছাপ। ‘পর-পর তিনটে বাড়িতে ডাকাতি! টাকাপয়সা-গয়নাগাটি সর্বস্ব নিয়েছিল। কেউ বাধা দেয়নি। শুধু শুধু তিনটে লোককে খুন!’

আনন্দ বলল, ‘খুন করাটা এখন একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এই তো সেদিন হাইওয়ের ওপর একটা ভল্‌ভো বাসে ড্রাইভারের মাথায় পাইপগান ঠেকিয়ে এক ডাকাত বলল— এক্ষুনি বাস দাঁড় করা। নিরীহ ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে বাস দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু ছাড় পায়নি, বাস থামাবার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি। ড্রাইভার লুটিয়ে পড়েছিল স্টিয়ারিংয়ের ওপর। আসলে এটা এখন দস্তুর হয়ে গেছে। প্রথমেই গুলি করে দু-তিনটে লোককে মেরে আতঙ্কগ্রস্ত করে দাও সবাইকে, তারপর নির্বিবাদে লুঠপাট চালাও। ওদের কাছে খবর ছিল, এক কারবারি মোটা টাকা নিয়ে যাচ্ছে, সেটা তো নিলই, অন্য যাত্রীদেরও বাদ দিল না। একটা বাচ্চা মেয়ের কান ছিঁড়ে দুল পর্যন্ত নিয়ে গেছে!’

এযা চাপা গলায় বলে উঠল, ‘ইশ্!’

খানিকটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল উদয়ন। ‘এখানে এখন প্রশাসন বলে কিছু নেই। যে যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে দু-চারটে ধরা পড়ে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। কিছুদিন জেল কাস্টডিতে থাকার পরে জামিন পেয়ে যায়। ওদের কাজ হল তখন সাক্ষীদের শাসানো। তাতে কাজও হয়। ভয়ে সাক্ষীরা আর মুখ খোলে না। তারা জানে, বিপদে পড়লে তাদের বাঁচাবার জন্য কাউকে পাওয়া যাবে না। ব্যস, প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস পেয়ে যায় সবক'টা ডাকাত। ধরতে গেলে সব জায়গাতেই একই ব্যাপার চলছে।’

হতাশ গলায় এযা বলল, ‘তোরা ডাকাতি করছিস কর, কিন্তু নিরীহ লোকগুলোকে প্রাণে মারছিস কেন?’

‘বাহ্! প্রমাণ দিতে হবে না!’

‘কিসের প্রমাণ?’

‘ওরা টয় পিস্তল নিয়ে ডাকাতি করতে আসেনি। পিস্তলগুলো যে সত্যি সেটা জানাবার জন্যই গুলি করে লোক মারা। রক্তাক্ত দু-তিনটে লোক গড়িয়ে পড়লে ডাকাতি করা সহজ হয়ে যায়।’

‘ওদের কাছে মানুষের প্রাণের দাম বলে কি কিছু নেই?’

এযার কথায় আবার হেসে উঠে উদয়ন বলল, ‘ওদের ভয়, লোকের প্রাণের দাম দিতে গেলে ওরা মারা পড়তে পারে।’

সন্ধ্যেবেলায় জোর একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, এখন হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। চারদিক নির্জন। ডাকাতির গল্পের শৈত্য চারজন মানুষকে বোধহয় খানিকটা চেপে ধরেছিল।

কাল শেষরাতের দিকে বসিরহাটের কাছে পর-পর তিনটে বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। একটু আগেই এখানকার এই চারজন তিনটে বিধ্বস্ত বাড়ি আর ভেঙেপড়া পরিবারের ছবি দেখেছে টিভিতে। সেই দৃশ্যগুলো এখনও বোধহয় ওদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

অনন্যা ঠিক আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিল। আগের মতো গলাতেই আগের কথাটা বলল, ‘সেকালের ডাকাতরা কিন্তু এত খারাপ ছিল না।’

‘কীরকম?’

আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে আবার মুখ খুলল অনন্যা। ‘ঠাকুমার মুখে শোনা। আমার ঠাকুমা মারা গেছেন সাতানব্বই বছর বয়সে। কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত টনটনে জ্ঞান ছিল। আর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। দারুণ ভালো গল্প বলতে পারতেন। পুরনো দিনের অনেক গল্প শুনেছি ওঁর মুখে। তার মধ্যে ওই ডাকাতদের গল্পও ছিল।’

‘ভালো ডাকাত!’

উদয়নের খোঁচাটা গায়ে মাখল না অনন্যা। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, ‘অল্প বয়সে ঠাকুমার মুখ থেকে শোনা। কিন্তু পুরো গল্পটাই আমার স্পষ্ট মনে আছে।’

‘কোথায় ডাকাত পড়েছিল? তোমার ঠাকুমার বাড়িতে?’

এযার প্রশ্নের উত্তরে দু'দিকে মাথা নাড়িয়ে অনন্যা বলল, ‘না, ওঁদের বাড়ির ঠিক পাশের বাড়িতে। ঠাকুমারও তখন বয়স বেশি নয়। তার মানে আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগের ঘটনা। ঠাকুমারা তখন উত্তরবঙ্গে থাকতেন, ডুয়ার্সের কাছাকাছি। ঠাকুর্দা সবে ওকালতি পাশ করে কোর্টে যাতায়াত শুরু করেছেন। পসার-টসার তখনও তেমন জমেনি। ঠাকুমাদের ঠিক পাশের বাড়িটাই ছিল বিশাল এক কাঠের কারবারির বাড়ি। উত্তরবঙ্গ তো কাঠের ব্যবসার জন্য বিখ্যাত। ওখানে তখন ব্যবসা বোধহয় আরও বেশি হত। তখন ওখানে বনজঙ্গল,

গাছপালা আজকের তুলনায় ঢের বেশি ছিল। গাছকাটার ওপর এখনকার মতো নিষেধাজ্ঞাও ছিল না। তবে রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। আর লোকসংখ্যা ছিল আজকের তুলনায় নামমাত্র। ঠাকুমারা যে জায়গাটায় ছিলেন, সেখানে বিদ্যুতের আলো বহু বছর পরে এসেছিল। সেই সময় আলো বলতে ছিল লম্ফ বা কুপির আলো। ঠাকুমা বলতেন, সূর্য ডুবলেই মনে হত মাঝরাত নেমে গেছে।'

'ডুয়ার্সের দিকে গেলে এখনও ওইরকম মনে হতে পারে। একশো বছর আগের অবস্থা তো আরও ভয়ানক। ডাকাত কি সন্ধেবেলাতেই পড়েছিল?'

'না-না। বিয়ের লগ্ন ছিল একটু বেশি রাতের দিকে, তারপরেই। মস্ত বড় ব্যবসায়ীর একমাত্র মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল খুব ঘটনা করে। বড়লোক বাবা, মেয়েকে একেবারে সোনাদানায় মুড়ে দিয়েছিলেন। বিয়েতে আশপাশের পাঁচটা গাঁয়ের লোকের নেমন্তন্ন হয়েছিল। ঠাকুমারা প্রতিবেশী, বাড়ির বউদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিস্তর কাজকর্ম করেছিলেন। বিয়ে মানে আজকের মতো নয়। গেলাম, উপহার দিলাম, তারপর কেটারারের খাবার খেয়ে ডুক করে কেটে পড়লাম। ঠাকুমা এমন সুন্দরভাবে গল্প করতেন যে আমরা চোখের সামনে সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পেতাম। সে আমলের বড়লোক, বিয়ের দিনপনের আগে থেকেই বাড়িতে অনেকগুলো লোকের পাত পড়ত দু'বেলা। এমোজন, বোমোজন, আত্মীয়স্বজনে বাড়ি ভরাট। বৈশাখ মাসে বিয়ে, শোবার অসুবিধা ছিল না। টানা বিছানা পাতা হত। অন্দরমহলে মেয়েরা পুরুষরা বৈঠকখানা আর দাওয়ায়। ঠাকুমা বলতেন— বিয়েবাড়ি আর যজ্ঞিবাড়ি যেন একসঙ্গে মিশে গিয়েছিল।'

'অতগুলো লোক ডাকাতদের আটকাতে পারল না!'

উদয়নের কথায় ফুঁসে উঠেছিল অনন্যা। 'বসিরহাটে পরপর তিনটে বাড়িতে ডাকাতি হল। তিন বাড়িতে অনেক লোক, তারপর গুলির শব্দে গাঁয়ের লোকেরাও জেগে গিয়েছিল, কেউ কি ডাকাতদের বাধা দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছে? আসবেই বা কী করে? ওই লোকগুলো নিরস্ত্র আর ডাকাতদের হাতে পিস্তল, পাইপগান, বোমা। মংলু সর্দারের বিরাট দল ছিল। সবার হাতে সড়কি, রামদা, পাকা বাঁশের মস্ত লাঠি— কে এগোবে?'

'মংলু সর্দার কে?'

'ওই ডাকাত দলের সর্দার। আশপাশের বিশটা গাঁয়ের লোক ওকে একডাকে চিনত। ওর নাম শুনলেই নাকি কাঁপুনি ধরে যেত সবার। ভয়ঙ্কর ডাকাত। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেই সড়কিতে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাবে, কিংবা রামদার এক কোপে ধড়-মুণ্ডু আলাদা। ঠাকুমা বলেছেন, মংলু সর্দারের দলটা ছিল নাকি ছোটখাটো একটা সৈন্যবাহিনীর মতো। রামদা, বল্লম, তরোয়াল আর বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে পুলিশের দলও নাকি ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। মংলু অনেক সময় আবার আগে থেকে চিঠি পাঠিয়ে ডাকাতি করতে যেত।'

'চিঠি পাঠিয়ে ডাকাতি!'

'হ্যাঁ। তখন নাকি এটা বড়-বড় ডাকাতদের রেওয়াজের মধ্যে পড়ত। লিখত— অমুক দিন, অমুক সময় তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি। এত টাকা আর এত ভরি সোনা মজুত রাখবে।'

'কী সাহস! তা ওই চিঠি নিয়ে কেউ পুলিশের কাছে ছুটত না?'

'আমিও ঠাকুমাকে এই প্রশ্নটা করেছিলাম। ঠাকুমা বলেছিলেন— কেউ কেউ যে যেত না, তা নয়। কিন্তু তার ফলটা হত মারাত্মক। বৃটিশ আমল তখন। বৃটিশ পুলিশের যা কিছু কেরামতি সব শহর আর আধা-শহরে। দূরের গাঁ-গঞ্জে ওদের তেমন কোনো দাপট ছিল না। পুলিশ গৃহস্থকে বাঁচালেও ক'দিন বাঁচাবে! দু-এক দিন, বড়জোর সাতদিন। তারপর?'

আনন্দ মৃদু হেসে বলল, 'একটু রকমফের হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই ব্যাপারটা এখনও চলে। ঠিক আছে, তখনকার কথাটাই শুনি। ডাকাতদের চিঠির কথা পুলিশকে জানালে কী হত?'

চেয়ারে টানটান হয়ে বসেছিল অনন্যা। 'তখন ডাকাতদের লোক ফিট করা থাকত সব গাঁয়েই। তারাই খবরটা পৌঁছে দিত ডাকাতদের কাছে। পুলিশে খবর দেওয়া ডাকাতদের হিসেবে মস্ত অপরাধ। সুযোগ বুঝে একরাত্তিরে হানা দিত অবাধ্য ওই গৃহস্থের বাড়িতে। অবাধে লুঠপাট চালাত। তারপর রামদার কোপে বাড়ির সবক'টা প্রাণীর ধড়মুণ্ডু আলাদা করে দিত। চিঠির কথা পুলিশকে জানাবার ওটাই ছিল শাস্তি।'

আঁতকে উঠেছিল এষা। 'কী সাঙ্ঘাতিক! এদের প্রাণে দয়ামায়া বলে কি কিছু ছিল না?'

'ছিল। যারা কথা শুনত তাদের জন্য ছিল।'

'কীরকম?'

KALPATARU AGROFOREST ENTERPRISES (P) LTD.

(Leading Raw materials supplier to the Paper & Rayon Mills in India)

Head Office

22, Stephen House (II nd Floor)
56E, Hemanta Basu Sarani (Old 4E, B.B.D. Bagh)
Kolkata - 700001
Phone : 033-22430156 / 22485101 / 22311182
Fax : 033-22101238
E-mail : Kalptaru@cal.vsnl.net.in

Branch Office

"Panchvati",
2/517, Vijay Khand Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Uttar Pradesh
Phone : 3021536

Modern Jewellers

House of Ladies Garments and Fancy Jewellery

VIP Market, Shop No. 28
Opposit Pantaloon
Phool Bagan, Kolkata - 700 054
S. K. Kamani

KHIMJEE HUNSRAJ

Head Office : 9, Rabindra Sarani,
Kolkata - 700 073
Tel. : (033) 2235-4486 / 87 / 88 / 95,
3092-4221
Fax : 2221-5638
E-mail : office@khimjee.com
Web Site : www.khimjee.com

'ডাকাতের চিঠি পেয়ে বেশিরভাগ মানুষই প্রাণ বাঁচাবার জন্য ছুটোছুটি করে টাকাপয়সা, সোনাদানা জোগাড় করে রাখত। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যেত, চেষ্টা করেও ডাকাতের ফরমায়েস মতো টাকা আর সোনা জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। গৃহস্থ তখন ওই ডাকাতের পায়ে পড়ে বলত— বিশ্বাস করুন, হাজার চেষ্টা করেও আমি এর বেশি আর জোগাড় করে উঠতে পারিনি। ডাকাত সেকথা বিশ্বাসও করত। কোনো কোনো ডাকাত আবার জোগাড়-করা টাকার একটা অংশ গৃহস্থের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলত— ঠিক আছে, এটা তোমার কাছে রেখে দাও।'

ঠাট্টার হাসি হেসে উঠে উদয়ন বলল, 'বাহ! চমৎকার! এটাকে তুমি কি সেকেলে ডাকাতদের নীতিবোধ বলবে?'

উদয়নের হাসি আরও দু'জনের ঠোঁটেও ছড়িয়ে পড়েছিল কিছুটা। কঠিন গলায় অনন্যা বলল, 'এর মধ্যে যে নীতির ব্যাপারটা একেবারে নেই, তা নয়; তবে একে আমি নীতিবোধ বলছি না।'

'কোনটাকে বলছ তাহলে?'

'উত্তরবঙ্গের ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাত পড়ার গল্প বলা এখনও আমার শেষ হয়নি।'

কৌতূহলী গলায় এষা বলে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলো তুমি।'

চেয়ারটাকে একটুখানি ঘুরিয়ে নিয়ে আবার মুখ খুলল অনন্যা। 'ছেলের মা-ই উদ্যোগ নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠাকুমা বলেছেন, মেয়েকে দেখতে ছিল সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীর মতো। যেমন গায়ের রং, তেমনি গড়ন। দেখলে নাকি চোখ ফেরানো যেত না। পাত্রপক্ষ যে খুব একটা বড়লোক তা নয়। তবে ছেলে লেখাপড়া জানা, দেখতেও ভালো। আসলে মেয়ের বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলেকে ঘরজামাই করে রাখা। করেছিলও তাই। তবে সেটা পরের কথা। মেয়ের আশীর্বাদে নিজের বিয়ের জাবদা নেকলেস আর মানতাসা দিয়েছিল ছেলের মা। নানা জায়গা থেকে উপহার হিসেবে আরও অনেক গয়নাপত্তর পেয়েছিল মেয়ে। আর মেয়ের বাবা যে কত দিয়েছিল তার হিসেব রাখা কঠিন। ঠাকুমা বলতেন, জীবনে বহু বিয়ের কনে দেখেছি, কিন্তু অমন সারা গা গয়নায় মোড়া কনে আর একটাও দেখিনি। বিয়ে শেষ হতে হতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল, তারপরেই ডাকাত পড়ল বাড়িতে।'

একটু বুঝি শিউরে ওঠার গলায় এষা বলল, 'তারপর?'

সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করে গল্পের খেই ধরল অনন্যা। 'ঠাকুমার নিজের চোখে দেখা। বলেছেন, মংলু সর্দারে চেহারা যেমন বিকট, গলার স্বরও তেমন। বিয়ের আসরে রামদা হাতে মংলু সর্দার লাফিয়ে পড়ে হুঙ্কার দিয়ে বলেছিল, কেউ টুঁ শব্দ করবে না। নড়াচড়া যা করার কাল সূয্যি ওঠার পরে করবে। গোটা বাড়ি ঘিরে রেখেছে আমার লোকজন। কেউ চালাকি করার চেষ্টা করলে কেটে চার টুকরো করে ফেলব। তারপর মেয়ের বাবার দিকে তাকিয়ে বলেছিল— বাড়ির মেয়েদের কাউকে বলুন, নতুন বউয়ের গায়ের গয়নাগুলো খুলে পুঁটুলি বেঁধে সামনে রাখতে। আর আমার লোক আপনার সঙ্গে যাচ্ছে, সিন্দুকের টাকাগুলো ওর হাতে তুলে দিন। কোনোরকম উল্টোপাল্টা মতলবের মধ্যে গেলে কেউ কিন্তু প্রাণে বাঁচবে না।'

এষা ছটফটে ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'প্রাণে বাঁচলে তো টাকাপয়সা, গয়নাগাটি! সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল নিশ্চয়! তা, ওসব পেলেই যে ওরা শান্ত হয়ে চলে যাবে, তা তো নয়। গত সপ্তাহের নদীয়ার ডাকাতিটা কী ভয়ানক! সর্বস্ব লুঠ করার পরে ডাকাতদের চোখ পড়েছিল মেয়েদের ওপর। ছি-ছি, জন্তুজানোয়াররাও বোধহয় ওদের চাইতে বেশি সভ্যভব্য হয়। আজ যখন প্রকাশ্য রাজপথেই এসব ঘটনা ঘটে, আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ডাকাতরা সেদিন কী কুৎসিত সব অত্যাচার চালিয়েছিল, বুঝতে পারছি। সেদিনের সেই মংলু সর্দারের গল্প তোমার আর ভেঙে বলার দরকার নেই। আমরা সব বুঝে গিয়েছি।'

উত্তরে কেমন যেন কঠিন গলায় অনন্যা বলে উঠল, 'না, ভেঙেই বলব। সবার জানার দরকার আছে। আজকাল যারা ডাকাতি করে তাদেরও।'

দু'দিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে আনন্দ বলল, 'এখনকার ডাকাতরা জেনে কী করবে?'

অনন্যার গলায় এখন যেন ছুরির ধার। 'উত্তরাধিকারের দায় সব মানুষেরই থাকে। ডাকাতদেরও আছে। এখনকার ডাকাতরা জানবে না আগের ডাকাতরা কী করত!'

'জেনে কী করবে?'

'কিছুটা নীতি মেনে চলতে পারে।'

উদয়ন হেসে উঠল। 'এ তো সোনার পাথরবাটি! নীতিনিষ্ঠ ডাকাত! নীতিজ্ঞান এলে তো ডাকাতি করাই ছেড়ে দেবে। ওই যে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন না— চোররা চুরি করে,

Dr.Shyama Prasad Mukherjee was a Staunch Nationalist throughout his life and his love for the Country knew no bounds.

R. C. Bhandari (HUF)

8, Camac Street,

36, Basement,

Kolkata–700017

With Best Compliments From -

W L

Willowood Chemicals Private Limited

Mfg. by : Ringo Foods & Beverages (P) Ltd.

সে দোষ চোরদের নয়, কৃপণ ধনীর। মজা করে বললেও কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্যি আছে। এখন তো ডাকাতরা আর সেকেলে ডাকাতদের মতো কাঁধ পর্যন্ত বাবরি চুল রেখে, কানে জবা ফুল গুঁজে, হাতে লাঠি আর রামদা নিয়ে ডাকাতি করে না। এখনকার ডাকাতদের আর পাঁচজনের মতো পোশাক-আসাক। কেউ কেউ লেখাপড়াও শিখেছে, ওদের চাকরি দাও, ওরা ডাকাতি করবে না। চাকরি কোথায়? নতুন এমপ্লয়মেন্ট বলে কিছু নেই। খাবে কি? ওই যে বলে না, অভাবে স্বভাব নষ্ট। আগে ডাকাতের সংখ্যা কম ছিল, এখন বেড়ে যাওয়ার ওটাই কারণ।'

অনন্যা ক্ষেপে গেল। 'তোমার লেকচার থামাও তো। এর পরেই তো বস্তাপচা সব তত্ত্বকথা টেনে আনবে।'

অনন্যার কথায় হেসে উঠেছিল সবাই, কিন্তু ওর মুখে হাসি নেই। কঠিন মুখে কঠিন গলায় অনন্যা বলল, 'সেকেলে ডাকাতরা কোথাও কোথাও কিছু নীতি মেনে চলত। সেটাই বা কম কীসে! ওই যে মংলু সর্দার যে কথাটা বলেছিল, তার মধ্যে কিছুটা কি নীতি ছিল না?'

অবাক হয়ে এষা জিজ্ঞেস করল, 'কি নীতি?'

'মংলু সর্দার নতুন বউয়ের গা থেকে গয়না খোলার জন্য নিজে হাত লাগায়নি, দলের কাউকেও বলেনি। এটা কি শিষ্টতা নয়? নিজেরা এর মধ্যে না গিয়ে মেয়ের বাবাকে বলছিল— বাড়ির মেয়েদের কাউকে বলুন, নতুন বউয়ের গা থেকে গয়নাগুলো খুলে পুঁটুলি বেঁধে সামনে রাখতে। এর চেয়ে বড় শিষ্টতা আর কী হতে পারে?'

প্রশ্নটা সরাসরি ভেতরের অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। অনন্যার প্রশ্নের

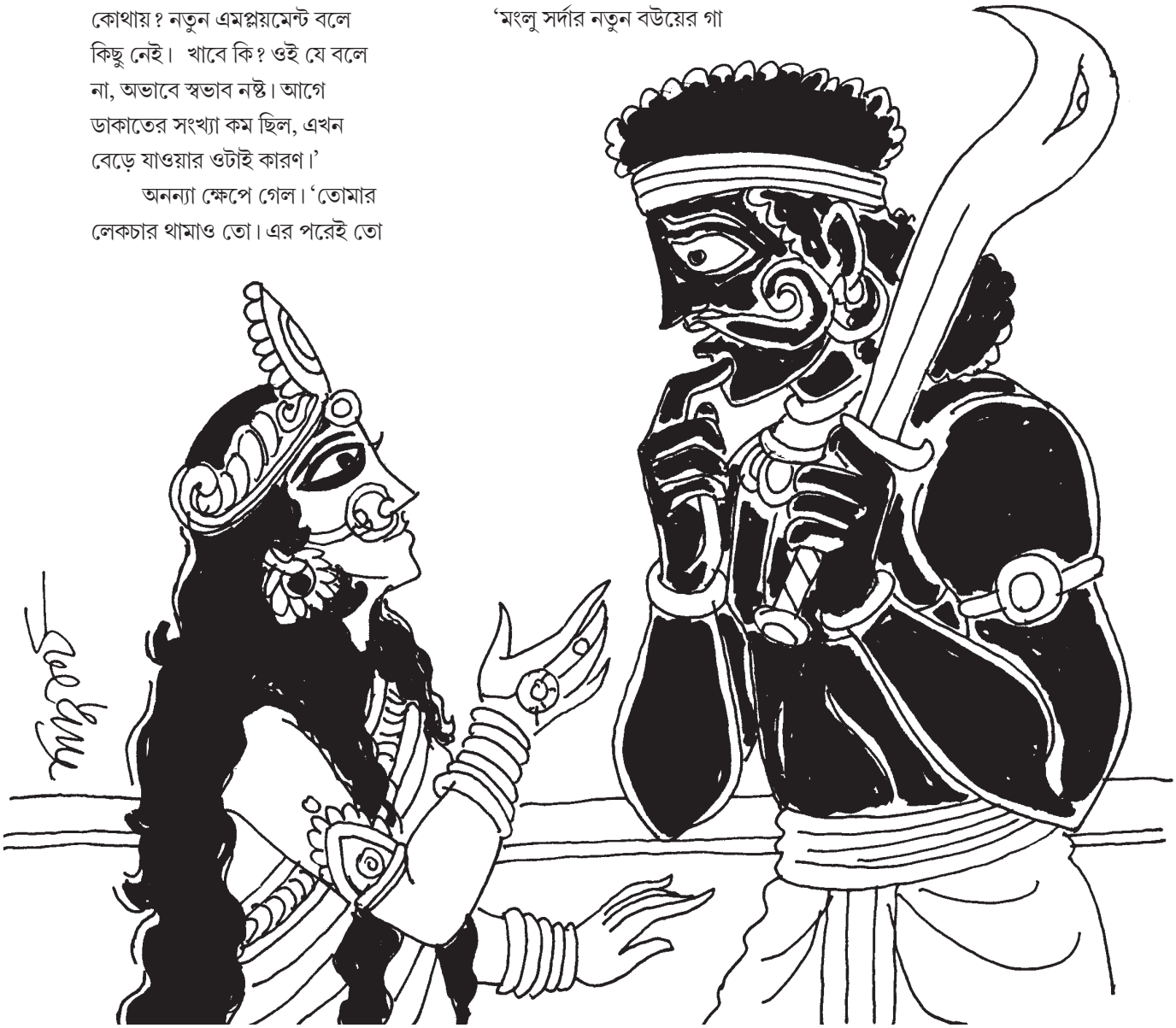

জবাবে এবার আর কারও মুখ থেকে কোনো কথা বার হয়নি। পরিবেশ হঠাৎই বুঝি একটু থমথমে হয়ে গিয়েছিল। একটু আগেই জোর একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝেই দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে ঘরের মধ্যে। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, কিন্তু সবারই বুঝি মনে হয়েছিল হাওয়া আর একটু বেশি থাকলে ভালো হত!

এতক্ষণ একটানা কথা বলার জন্য একটু বুঝি হাঁপাচ্ছিল অনন্যা। চোখমুখে লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ও থামল না। একটু কেটে কেটে বলল, 'ওই বাড়ির এক বউ কাঁপতে কাঁপতে গয়না খোলার জন্য যেতেই ফুঁসে উঠেছিল নতুন বউ। তারপর ছুটে গিয়ে ওই মংলু সর্দারের সামনে দাঁড়িয়ে গলা তুলে বলেছিল— তুমি আমার বাবার মতো। আমি তোমার মেয়ে। তুমি কি চাও তোমার মেয়ে এক কাপড়ে, শুধুমাত্র শাখা-সিঁদুর নিয়ে, শ্বশুরবাড়িতে ঘর করতে যাবে? তাই কি চাও তুমি? ওইটুকু এক মেয়ের মুখে ওই কথাগুলো শোনার পরে রীতিমত মিইয়ে গিয়েছিল ভয়ঙ্কর ওই ডাকাত। তারপর ডাকাতি না করে দলবল সমেত ওই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এটা কি নীতিবোধ নয়?'

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য মুখ খুলল না কেউই।

কেমন যেন অস্বস্তিকর নীরবতা ছড়িয়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। একটু আগের সেই জমজমাট আড্ডা বুঝি কত দূরের ঘটনা! আনন্দ অন্য একটা প্রসঙ্গ টেনে এনেছিল, কিন্তু সেটা ঠিক দানা বাঁধল না। এলোমেলো ভাবে আরও কিছুক্ষণ কথা চালাচালি হল, কিন্তু আড্ডা কিছুতেই আর আগের মতো জমল না।

খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক আসছিল বারবার। আনন্দ বলল, 'আবার বোধহয় জোর বৃষ্টি নামবে, উঠেপড়ি এবার।'

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়েছিল ও। এষাও উঠল। একটু আগে অনন্যা যে ছবিটা দেখিয়েছে সেটা এখনও বুঝি আলৌকিক কোনো উপায়ে এষার চোখের সামনে ভাসছিল। কালোকালো প্রকাণ্ড চেহারার এক ডাকাত। বাবরি চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। হাতে ধরা মস্ত এক রামদা। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ডাকাতের চোখের মধ্যে শুধুই স্নেহ আর মমতা।

ওদের দু'জনকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল উদয়ন আর অনন্যা। বিদায়বেলায় যে ধরনের কথাবার্তা বলা হয়, আনন্দ সেই ধরনের কথাই বলছিল, কিন্তু এষার মুখ থেকে একটা কথাও বার হয়নি।

With the best Compliments from :

Phone : 2237-5919
2237-2090
2237-2822
Fax : 2237-0269
E-mail : kolkata@allindatpt.com
Web-site : www.allindiatpt.com

ALL INDIA ROAD TRANSPORT AGENCY
AIRTA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
ALL INDIA PACKERS & MOVERS

H.O. : 28, BLACK BURN LANE,
KOLKATA-700 012

Time Guaranteed delivery. Transporters for all over India, Marine type ISO Container trucks available. Bank-approved specialists in ODC Cargoes by heavy duty Trucks & Trailers. Specialists in packing of household goods & Transpotation. Branches & Association all over India.

अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो
जान लेवा हो सकता है ।

SHREE
ULTRA
RED-OXIDE

जंग रोधक सीमेंट

SHREE CEMENT LIMITED

Registered Office :
Bangur Nagar, Beawar, Dist. Ajmer
(Rajasthan) 305 901
Phs. : +91 01462 228101-106
Fax : 01462 228117/119
e-mail : sclbwr@shreecementltd.com

Corporate Office :
21 Strand Road, Kolkata 700 001
Phs. : +91 33 2230 9601-04
Fax : +91 33 2243 4226
e-mail : sclcal@shreecementltd.com

Marketing Office :
1 Bahadur Shah Zafar Marg
122/123, Hans Bhawan, New Delhi 110 002
Ph. : 09313565826
Fax : +91 11 2370499
e-mail : scldel@shreecementltd.com

website: www.shreecementltd.com

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ—

Usha
Kamal

Kasat Marbles

19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001

Ph. No. Office : 2248-9947

Deals in : Marble, Granites Tiles,
Ceramic Tiles, Stone etc.
Authorised Dealer of

KAJARIA CERAMICKS LTD.
'NAVEEN' brand tiles
REGENCY CERAMICES LTD.
BELLS CERAMICES LTD.
ORIENT TILES

Showroom :
32A, Tollygunge Circular Rd. kolkata - 53
Show Room - 24004154 / 24002858

Godown :
3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)
Godown : 2403-4014

With Best Compliments From :

Wadhwana

"Park Center"
24, Park Street,
Kolkata - 700016
Phone :2229-8411/1031/4352
Fax : 91 33 2229-0492
e-mail : wadhwana@vsnl.com

উপন্যাস

জল রংয়ে আঁকা ছবি মুছে যায়

সুমিত্রা ঘোষ

'ঠাম্মা, আমি বেরিয়ে পড়ছি। ও ঠাম্মা! কোথায় হারিয়ে যাও বলত? কি এত চিন্তা কর? আমি বের হচ্ছি, শুনছ?'

স্বস্তিকা আজকাল সত্যিই যেন হারিয়ে যান কোথায়! জীবনের মাকড়শাজালে জড়িয়ে ফেলা মনটাকে ছাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারেন না। রোমশ, বিষাক্ত, লিকলিকে হাত-পাগুলো এখনও তাকে আঁচড়ায়। ফেলে আসা অতীতকে তিনি হাড়ে হাড়ে চিনেছেন, ভবিষ্যৎ সব মানুষের মতো তার কাছেও অজানা। তার বর্তমান মোটামুটি। সুখপ্রদ হয়ত বলা যদি অতীতের পোড়া ঘাগুলো পুরোপুরি শুকিয়ে যেত, যদি স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে ভুলে যেতে পারতেন সবকিছু। যদি জ্বালা-যন্ত্রণা না থাকত, তাহলে হয়ত ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করে দিতে পারতেন কৃতজ্ঞতায়। জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে পারিবারিক সংস্কারের প্রভাবে ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস জন্মেছিল মনে। অর্ধেকের বেশি জীবন কেটেছে ন্যায়, নীতি, ধর্মের পথ কামড়ে ধরে থেকে। কাছের মানুষদের ছলনা, শঠতা, দুর্নীতির সঙ্গে নীরবে আপোস করে থেকেছেন সংসারের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। — 'কর্মেন্য বাধিকারস্তু মা ফলেষু কদাচন'— এর অর্থ তিনি জানতেন। নিজের জীবনে মানতেও অক্ষরে অক্ষরে। সংসারে, কর্মস্থলে কখনো শত্রু-মিত্র ভাগাভাগি করেননি। নিজের কাজ যেমন নিষ্ঠায় করেছেন, তেমনই সকলের প্রয়োজনে সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও সাহায্য করেছেন। প্রতিদানে একটু ভাল ব্যবহার ছাড়া কিছু চাননি। জীবন সংগ্রামে সংঘর্ষ করে নিজের পায়ে দাঁড়ানো মানুষ তিনি। দিতে শিখেছেন, নিজেরটা নিজেই জোগাড় করতে অভ্যস্ত ছিলেন— চাইতে জানতেন না। বিশ্বাস করতেন, সুকর্মের ফল না চাইলেও পাওয়া যায়। ঈশ্বর নিজেই দেন বিনা কার্পণ্যে। কিন্তু তাঁর জীবনে ঈশ্বর নিষ্ঠুর হয়ে মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন। সারা জীবনের তপস্যার শেষে সন্ধ্যেবেলায় স্বস্তিকা অবশেষে বিশ্বাস হারাতে বাধ্য হয়েছেন। এখন তিনি এক ঘোর নাস্তিক মানুষ বলা যায়।

তর্পণের ডাকে সম্বিত ফিরে আসে। কাঁধে পিঠব্যাগ নিয়ে একেবারে তৈরি হয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে ও। জিজ্ঞেস করেন— 'বেরিয়ে পড়ছিস? একেবারে তাড়াহুড়ো করবি না। ট্রেনে সিট পাওয়া নিয়ে যেন কারও সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাস না। এখন যা দিনকাল পড়েছে, কথায় কথায় ধাক্কা মেরে ট্রেন থেকে ফেলে দিচ্ছে। মানুষ আর মানুষ নেই। সাবধানে যাবি। আয়, রওনা হয়ে পড়।'

প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে তর্পণ বলে— 'আমি তোমার সব উপদেশ মেনেই চলি ঠাম্মা, কিন্তু তুমি আমার একটা কথাও শোনো না। প্রত্যেকবার এসে বলে যাই, ওষুধপত্র খাওয়া-দাওয়া মালতীদির কথা শুনে খেয়ো। তুমি সেটা কর না। মালতীদি বলেছে, 'তুমি প্রায়ই ব্রেকফাস্ট স্কিপ কর, ওষুধ স্কিপ কর, বেশি বললে রেগে যাও। এরকম অবুঝের মতো আচরণ করলে আমাকে পড়াশুনো ছেড়ে এখানে চলে আসতে হবে। আর সেটা যে আমি করতে পারি তুমি বেশ জানো।'

স্বস্তিকা আঁতকে ওঠেন, — 'ওরে ওসব কথা মনেও আনিস না। এটা তোর ফাইনাল ইয়ার। কত আশা নিয়ে বসে আছি, তুই জানিস! আসলে ওষুধ খেয়ে খেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাই মাঝে মাঝে খেতে ইচ্ছে করে না। আর এই বয়সে কি বেশি খাবার খাওয়া যায়, বল? স্টমাকটাই ছোট হয়ে যায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। যাক্‌গে, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি আর দেরি না করে রওনা হয়ে পড়।'

ভাগ্যক্রমে জানালার ধারে বসার জায়গা পেয়ে গেল তর্পণ। সাধারণত খড়্গপুরগামী ট্রেনে বসার জায়গা পাওয়া যায় না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আজ কেন কি জানি তেমন ভিড় নেই। আই আই টি-র ছাত্র হওয়ার পর প্রথম বছর ও প্রত্যেক সপ্তাহে ঠাম্মাকে দেখতে চলে আসত। তবে এখন আর সেটা হয় না। ফাইনাল ইয়ারে স্বপ্ন পূরণের প্রস্তুতি এবং পরিশ্রম হলো একনম্বর বাধা। দু'নম্বর বাধা হলো ঠাম্মা নিজে।— 'আমি ঠিক আছি। আমাকে দেখতে আসার জন্য নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে হবে না তোমাকে। আমার ভাল থাকা, বাঁচা-মরা সবটাই তোমার ভবিষ্যৎ সৃষ্টির উপর নির্ভর করে আছে, বুঝেছ!'

মুখ-চোখ গম্ভীর করে ঠাম্মা এরকমই বলে। তর্পণ জানে ৬৮ বছরের ভগ্নস্বাস্থ্য ঠাম্মা নিজেই এক কঠিন পরীক্ষায় সম্মানে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াসে লড়াই করে চলেছে। ও শুধু দাবার বোড়ে। যে বোড়ে একদিন রাজাকে ফেলে দিয়ে কিস্তিমাত করবে। আর সেদিন ঠাম্মার পরীক্ষা পাশ। ওর সম্পূর্ণ সহযোগিতা এবং তীব্র ইচ্ছাশক্তি ঠাম্মার ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে প্রবল শক্তির জন্ম হয়েছে সেই শক্তি কখনও বিফলে যাবার নয়। ও যেদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে, যেদিন সমাজ ওকে একজন কাঙ্ক্ষিত মানুষ হিসাবে গ্রহণ করবে সেদিন ঠাম্মার বিজয়লাভ। সেদিন ওরও জন্ম সার্থক।

তীব্র গতিতে ছুটে চলা ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্যগুলোর প্রতি মুহূর্তে রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে ওর নিজের জীবনের কত যে সাদৃশ্য! যারা প্রখর স্মৃতিশক্তি নিয়ে জন্মায় তাদের বড় জ্বালা! হাজার চেষ্টা করলেও অপ্রিয় স্মৃতিগুলোকে ভুলে যাওয়া যায় না। এখন জানালা দিয়ে দেখা মাঠ-ঘাট, ক্ষেত, গোরু ইত্যাদি দৃশ্যগুলো যেমন দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে, ফেরার পথে আবার সেগুলো এমনি করেই

একের পর এক এগিয়ে এগিয়ে আসবে পেছনে চলে যাবার জন্য। ওরা কখনও মুছে যায় না, কখনও মিটে যায় না নিজের স্থান থেকে। হ্যাঁ, রূপ হয়ত বদলায়! আজ যেখানে সর্ষের হলুদ ফুলের শোভা কাল সেখানে কাঁটানটে শাকের ঝাড়। ওই যে গাছপালা ঘেরা ঠাণ্ডাঠাণ্ডা, মাটির ঘরখানা মন কেড়ে নিল— কাল ফেরার পথেই হয়ত একখানা করে ইঁটের তিন ইঞ্চির গাঁথনি দেওয়া পাথুরে দেওয়ালে মন ধাক্কা খেয়ে ব্যথা পাবে। তর্পণ এমনি করেই চব্বিশ বছরের জীবনে লক্ষ লক্ষবার ধাক্কা খেয়ে ব্যথা পেয়েছে। কারণ ওর স্মৃতি সদাজাগ্রত হয়ে ওকে কিছুই ভুলতে দেয় না। এখন ও নিজেই আর ভুলতে চায় না। প্রথম প্রথম ভুলে যেতে চাইত। তখন বয়স অনেক কম ছিল, মন সম্পূর্ণ বিকশিত হয়নি। পাঁচ-ছ বছর বয়সে দেখা অনেক অসুন্দর স্মৃতি চোখের সামনে এসে দাঁড়াত। এখনও ওরা আসে তবে এখন ওর মনের, ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছে, ও বুঝতে পেরেছে ওগুলো যখন ঘটেছে জীবনে তখন ওরা চিরকালের জন্য স্থিতিশীল হয়েই থাকবে স্মৃতিতে। সত্যকে জোর করে অস্বীকার করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। সত্য সত্যই থাকবে— হয়ত আজকের সর্ষে ক্ষেত কালকে কাঁটানটে হবে, কিন্তু জমিনটা তো থাকবেই চিরযুগ!

চোখ বন্ধ করে তর্পণ— একটা মস্তবড় অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি, যার বাইরের দিকটা আগুনের আঁচে পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে গেছে, যার ভেতরে ঢুকে বসে আছে একটা বাচ্চা ছেলে। ওর হাতে পাটের ছোবড়া, পাশে একটা বাটিতে রাখা গুল কয়লার ছাই। ছেলেটা ডেকচির ভেতরে বসেই ছোট ছোট হাতে ওটা মাজবার চেষ্টা করছে। এটা মেজে দিতে না পারলে ধাবার মালিক ওকে খেতে দেবে না, উল্টে দু-চার ঘা মার পড়বে পিঠে। এই কাজটা মা করত। মা মরে যাবার পর দিদি করত। ও তখন দিদির সঙ্গে সারাক্ষণ থাকত। দিদি ওকে কাছছাড়া করত না। বিশাল বড় বড় মালবোঝাই ট্রাকগুলো এখানে এসে থেমে যেত। ট্রাকের ড্রাইভাররা এখানে স্নান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে দড়ির চারপাইতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়বে। তখন ওকে পালা করে পা টিপে দিতে হবে ওদের। দিদিও করত। দিদি বড় ছিল তাই ও ভারী পাগুলো টিপতে পারত, কিন্তু ও পারে না ভাল করে, তাই ওরা ওকে ভাল বক্‌শিসও দেয় না।

ধাবার মালিক মাকে মাইনেও দিত আর বেঁচে যাওয়া ভাত-ডাল-তরকারিও দিয়ে দিত। ওরা তিনজনে পেটভরে খেত। ও ছোট, ভাল করে কাজ করতে পারে না, তাই ওর মাইনে নেই। শুধু খাবারটাই দেয়। পা টিপে ঘুম পাড়িয়ে দেবার জন্য দিদিকে এক একজন পাঁচ টাকা, দশ টাকাও দিয়েছে। ওকে একটা টাকা দিতে যেন কত কষ্ট ওদের। জামা-প্যান্ট ছিঁড়ে গেছে, তাই পরে থাকতে হয়। ও দোকানে গিয়ে কিনতেও জানে না। এই জামা-প্যান্টটা দিদি পথের ধারে বসা দোকান থেকে কিনে দিয়েছিল। দিদিটা যে কোথায় হারিয়ে গেল! একদিন সকালে উঠে দেখে দিদি নেই। সারাদিন গেল, রাত গেল, দিদি এলো না। ও কুকুরের মতো কুঁকড়ে ধাবার এক কোণায় বসে কাঁদছিল। ঘুম ভেঙে উঠে থেকে অনেক খুঁজেও দিদিকে কোথাও দেখতে পায়নি ও। ভয়ে হাত-পা কাঁপছে, কাউকে বলার মতো বুদ্ধি এখনও জন্মায়নি। জোরে কাঁদবার মতো সাহসও নেই। ধাবার মালিক তিওয়ারিজীর মারের কথা মনে করে। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে অবিরাম কেঁদে চলেছে বাচ্চা ছেলেটা। মা আর দিদি যাকে পিলে বলে ডাকত। ওর পেটটা দেহ থেকে বেরিয়ে থাকে। নাভিটাও গর্তে ঢোকানো নয়, কুলের মতো — এ্যাঁই! নবাবজাদা হারামজাদা! এখানে লুকিয়ে বসে আছিস তুই? তোর হারামজাদী দিদিটা কোথায়? আজ ওর একদিন কি আমার একদিন! সকাল থেকে ঝাড়ু দেয়নি, রাবণের গুষ্ঠির বর্তন পড়ে আছে। কৌন মাজবে ওসব? তুই? বল্ তোর দিদি কোথায়?'

তেওয়ারির গর্জনে ডুকরে কেঁদে ওঠে পিলে নামে ছেলেটা। ফোঁফাতে ফোঁফাতে বলে— 'আমি জানি না, দিদিকে কোথাও খুঁজে পাইনি।'

— 'তার মানে? তোর দিদি কি হাওয়া মে উবে গেল? কখন থেকে পাচ্ছিস না ওকে? রাত্রে শুয়েছিল এখানে?'

— 'হ্যাঁ। সকালে উঠে আর পাইনি। দিদি হারিয়ে গেছে।'

তেওয়ারির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। বেজন্মা হারামীর বাচ্চাগুলোকে দিয়ে একরকম নিখর্চায় এত কাজ তুলে নিচ্ছিল ও। কোন শালা ট্রাক ড্রাইভার বোকা-সোকা পনের বছরের মেয়েটাকে তুলে নিয়ে চলে গেছে কে জানে! যাক্ গে! পুঁটিকে পরে খোঁজা যাবে চুপিচুপি। লোক জানাজানি হলে আজকাল অনেক ঝামেলা। এখন এই রাবণগুষ্ঠির রাত্রের এঁটো বাসন আগে মাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে। পিলেকে দিয়ে বরং ঝাড়ুর কাজটা করিয়ে নেওয়া যাক। — 'এই! ওঠ্! প্যানপ্যান করে না কেঁদে তুই গিয়ে ঝাড়ু মারতে শুরু কর। আমি দেখছি, পুঁটি কোথায় গেছে।'

নোংরা দু'টো হাতের চেটোয় চোখ মুছে পিলে আশার গলায় জিজ্ঞেস করে— 'দিদি তাহলে হারিয়ে যায়নি! তুমি খুঁজলেই চলে আসবে, তাই না মালিক?'

— 'দাদা আর একটু চেপে বসুন। আর একজন বসতে পারবে।'

ঘোর কেটে বাস্তবে ফিরে আসে তর্পণ। জানালা ঘেঁষে সরে বসে। বহুক্ষণ পর কামরার ভেতরে দৃষ্টি নিবেশ করে।

কখন যে এত লোক উঠেছে কোন কোন স্টেশনে খেয়ালই করেনি। কামরাটা এখন ভিড়ে ঠাসা। এক একটা বেঞ্চে পাঁচজন করে বসেও বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে।

স্বস্তিকার সংসার বলতে তিন ইউনিটের একটা ছোট্ট অত্যন্ত সুখী পরিবার। স্বামী সপ্তর্ষি, স্বস্তিকা আর তাদের একমাত্র ছেলে সুহাগ। আসলে তাদের তিনটি সন্তান থাকার কথা ছিল, কিন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয় সন্তান জন্ম নিতে পারেনি গর্ভপাতের কারণে। সুহাগ তৃতীয় এবং শেষ সন্তান। ঐশ্বর্যবান না হলেও অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের অনটন নেই সেনগুপ্ত পরিবার এবং জ্ঞাতিগুষ্ঠিদের কারওই। শুধু অর্থ কেন, শিক্ষার ক্ষেত্রেও অগ্রণী এরা। যার ফলে কয়েক পুরুষ ধরে স্থানীয় সমাজে শিরোমণি হয়ে আছে বিরাট পরিবারটির শাখা-প্রশাখা। সপ্তর্ষি-স্বস্তিকারা এই মানী পরিবারের একটা ডাল মাত্র। সেনগুপ্ত পাড়া, সেনগুপ্ত স্কুল, লাইব্রেরি, দীঘি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র— সমাজের সর্বস্তরে এই বংশের অবদান অস্বীকার করা যাবে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বংশবৃদ্ধি হয়ে সেনগুপ্ত পরিবার এই শহরের সীমানা পার হয়ে দূরে দূরে, দেশে-বিদেশে নিজেদের পত্তন করেছে ঠিকই, কিন্তু মূল শিকড় এখানেই আছে। তাই সম্পর্কের সুতো ধীরে ধীরে পাতলা হতে থাকলে কি হবে, সুতোটাকে টিকিয়ে রাখার মোটামুটি প্রচেষ্টা সকলেই করে। সেটা বোঝা যায় দুর্গাপুজো, বিয়ের অনুষ্ঠান কিংবা কারও মৃত্যু শোকের সময়, যখন বিদেশ থেকেও পারিবারিক কর্তব্যের টানে বেশ ক'জন উড়ে চলে আসে কয়েকদিনের জন্য। এবাড়ি-ওবাড়িতে ভাগাভাগি করে থেকে আনন্দ বা শোকের সাথি হয়ে কয়েকদিন থেকে ফিরে চলে যায়। সুহাগের বিয়েতে এদেশর নানা জায়গা থেকে তো বটেই, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে উনিশজন সেনগুপ্ত এসেছিল, যাদের বেশিরভাগেরই বিদেশী বৌ কিংবা বিদেশী স্বামী। স্বস্তিকা-সপ্তর্ষির ব্যক্তিগত জীবনে একদিকে যেমন ভালবাসার চোরাস্রোত গোপনে প্রবাহিত হতো, অন্যদিকে তেমনি মহা 'ইগো' সঙ্কটে ভুগতে থাকা দুটো মানুষের মধ্যে মতের অমিলের চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে ঝড়ও তুলত। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, একমাত্র সন্তান সুহাগের জীবনের মানচিত্র তৈরির বিষয়ে ওরা নিজেদের 'ইগো' তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখে সহমত হতে মোটেই দ্বিধা করত না। স্বস্তিকার ইচ্ছে ছিল, সুহাগ ইংলিশ মিডিয়ামে কোনো নামজাদা মিশনারি স্কুলে পড়ুক। সপ্তর্ষি চেয়েছে ছেলে বাংলা মিডিয়ামে গভর্ণমেন্ট স্কুলে পড়ুক। ওর বক্তব্য ছিল— 'আমরা দুজনেই যদি বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া করে দুটো নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারছি, তাহলে আমাদের ছেলেও মানুষ হতে অসুবিধা হবে না স্বস্তি। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে আলাদা করে যে হাত-পাগুলো গজায় সেটা সবক্ষেত্রে সুফল দেয় না। হয়ত তোমার ছেলে গড়গড় করে ট্যাঁশ ইংরেজিতে কথা বলবে, নিজেকে খুব স্মার্ট বলে ভাববে, ষোল বছর বয়স থেকেই পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করবে কিন্তু পাড়ার কাউকে চিনবে না। ক্রিসমাসে ফুর্তি করবে, মাকালী, সরস্বতী এঁদের পুজো করবে না। ছেলে রামকৃষ্ণ, সারদা মা, বিবেকানন্দ সম্পর্কে অজ্ঞান থাকবে, তোমার মতো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারবে না— তুমি তো এসব মেনে নিতে পারবে না। আমিও পারব না। তার চেয়ে গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি হোক। যত্ন করে পড়ালে ও যে খুব ভাল রেজাল্ট করে বেরোবে সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ নেই। এ যুগে স্মার্ট হওয়ার প্রয়োজন আছে, অমি সেটা মানি, কিন্তু স্মার্ট হওয়ার চেয়েও বেশি জরুরি মানুষ হওয়া। বাঙালির ছেলে বাঙালির মতো হওয়া।'

স্বস্তিকা মেনে নিয়েছিল বিনা তর্কে, বিনা শর্তে। সুহাগ স্কুল ফাইনালে, হাইয়ার সেকেন্ডারিতে র‍্যাঙ্ক নিয়ে পাশ করেছিল। সপ্তর্ষির বন্ধু ধৃতিমান বসু সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইংরেজি পড়াত। ক্লাশ সেভেন থেকে সুহাগকে বিশুদ্ধ ইংরেজি শেখানোর জন্য ধৃতিমানের কাছে সঁপে দিয়েছিল সপ্তর্ষি। সম্ভবত ছ'বছর ধরে ধৃতিমানের সংস্পর্শে থাকার ফলেই ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল সুহাগ। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসতেই চাইল না ও। ইংলিশে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে চাইল। সপ্তর্ষির স্বপ্ন ছিল সুহাগকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবে। খড়্গপুর, দিল্লী, কানপুর— কোনো একটা আই আই টিতে পড়ুক ছেলে। এবার স্বস্তিকা বোঝালো— 'ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু করতে চেয়ো না। ও বড় হয়ে গেছে, নিজের জীবন কীভাবে গড়বে সেসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে শিখেছে। আমি জানি ও লক্ষ্যস্থির করেই ইংলিশ অনার্স পড়তে চাইছে। নিজের আগ্রহে যে সাবজেক্ট পড়তে চায়, সেটাই পড়তে দাও। এতেই ওর উন্নতি হবে। জোর করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ালে হয়ত পরে পস্তাতে হতে পারে।'

সপ্তর্ষি এককথায় স্ত্রীর যুক্তি মেনে নিয়েছিল। পরে ছেলের সঙ্গে মন খুলে কথা বলার সময়ই সুহাগ বাবাকে বলেছিল— 'আমার মোটেই ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে ইচ্ছে করে না, বাবা। আমি তোমাদের মতো এডুকেশন লাইনেই থাকতে চাই। ধৃতিমানকাকু তো বলেছে ইংলিশ লিটারেচার

নিয়ে পড়লে কাকু নিজেই পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত আমাকে পড়াবে।'

সপ্তর্ষি একথা জানে। ধৃতিমান নিজে ওকে বলেছে— 'তোর ছেলেটাকে পড়িয়ে যে আনন্দ পাই, অন্য কোনো স্টুডেন্টকে পড়িয়ে সেই আনন্দ পাই না রে সপ্তর্ষি। আমার মাস্টারি বিদ্যের সবটুকু সুহাগ নিংড়ে বের করে নিতে চায়। সবে তো এইচ এস দেবে, কিন্তু জানার আগ্রহ অনার্স স্টুডেন্টের চেয়েও বেশি।'

নিজের সন্তানের প্রশংসা শুনলে কার না ভাল লাগে? সেদিন সপ্তর্ষিরও খুব ভাল লেগেছিল। মার্কশিটে ইংরেজিতে পাওয়া নম্বর দেখে ফিফথ্ র‍্যাঙ্ক হোল্ডার সুহাগ সেনগুপ্ত নামের ছাত্রটিকে সাদরে ইংলিশ অনার্স কোর্সে গ্রহণ করেছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ।

তর্পণ চলে যাবার পর আরও কতক্ষণ হুইল চেয়ারেই বসে রইলেন স্বস্তিকা। মালতী দু'বার এসে বলে— 'এটাতে বসে আছো কেন বলতো মাসিমা? উঠে একটু হাঁটাহাটি কর না। এমন করে বসে আছো যেন তুমি পঙ্গু। ওঠো ওঠো।'

— 'এটাতে বসতে খুব আরাম তাই বসে থাকি। অত শাসন করতে হবে না। আর কিছুকাল পর এটাই আমার চলার সাথী হয়ে যাবে পারমানেন্টলি। দেখে নিও।'

মালতী বিরক্ত হয়ে বলল— 'বাহ্! এ আমি কার সেবার কাজ হাতে নিয়ে বসে আছি দু-বছর ধরে! এইটুকু কোমর ব্যথা নিয়ে লোক হিল্লি-দিল্লী ঘুরে বেড়াতে ছাড়ে না। বড়জোর একটা বেল্ট বাঁধে কোমরে। ইনি ইচ্ছে করে এই জগঝম্প হুইল চেয়ারটায় বসে ভবিষ্যতের জন্য কোমরটা সর্বনাশের ভোগে তুলে দিতে ব্যস্ত। এবার তর্পণকে ফোনে জানাতে হবে ব্যাপারটা।'

— ' আহ্ মালতী! বড্ড বাড়াবাড়ি করছ সামান্য ব্যাপার নিয়ে। খবরদার। তর্পণটার কান ভাঙ্গাবে না তুমি। বললাম তো, এটা বসার জন্য খুব কমফোরটেবল, তাই বসে আছি। বসেই আছি শুধু, চালিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছি নাকি? আমি তো আর পাগল নই!'

— 'তা নও বটে, তবে বেতের ঐ গদিমোড়া আরামচেয়ারটাতে তো বসতে পার! পড়ে গিয়ে যখন কোমরে আঘাত পেলে, যখন একেবারে নিরুপায় ছিলে তখন এটার প্রয়োজন ছিল। এখন সেই প্রয়োজন নেই। ডাক্তার তোমাকে হাঁটাচলা করতে বলেছে, এমনকী সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতেও বলেছে।... মাসীমা, তুমি এটাতে বসে থাকলে দেখতে ভাল লাগে না গো! এই আপদটা কেন তোমার পারমানেন্ট সঙ্গী হতে যাবে? তুমি তো নিজের পায়ের জোরে দিব্যি চলতে পার। কেন এরকম নেগেটিভ চিন্তা কর?'

স্বস্তিকা চেয়ারটা থেকে উঠে এসে ট্রেইন্ড নার্স মালতীর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ান।

— 'মালতী, তোমার সেবাযত্নে আজ আমি সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠেছি বটে, তবুও আমার মন থেকে ভয় যায় না। নেগেটিভ থিংকিং কেন মনে আসে জানো? কারণ, আমার সারা জীবন অসম্ভবকে সম্ভব করার সাধনায় কেটেছে। প্রচণ্ড পজিটিভ থিংকিং, পজিটিভ অ্যাটিচিউড নিয়ে কর্ম করে গেছি আমি, আর ঠিক যখন সাফল্যের পরিপূর্ণতার মুখ দেখব দেখব করছি, ঠিক তখনই সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হয়ে অজ্ঞাত অভিশাপে বারবার বিফলতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছি। একশো পার্সেন্ট পরিশ্রম করেছি সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে, ফলপ্রাপ্তির সময় আমি ওয়ান পার্সেন্টও পাইনি। যারা অসৎ উপায়ে ছলনা করেছে তারাই হানড্রেড পার্সেন্ট স্বীকৃতি পেয়েছে। তারাই সফল হয়েছে। আমি হেরে গেছি মালতী। তাই, এখন আমার মনে নেগেটিভ ছাড়া কোনো পজিটিভ চিন্তা আর আসে না। যদি আমার শেষবারের প্রচেষ্টাটুকু সফল হয় তাহলে হয়ত আবার পজিটিভ চিন্তা আসতে পারে মনে এই বয়সেও। বুঝলে?'

মালতী স্বস্তিকার হাতদুটো ধরে নরম গলায় বলে— 'তোমার মনে যে এত কষ্ট জমে আছে, বুঝতে তো পারিনি মাসিমা। বেশিরভাগ সময়ই তুমি চুপচাপ থাকো, প্রয়োজন ছাড়া কথা বল না। আমি দেখেছি, তুমি খুব অন্যমনস্ক হয়ে থাকো, যেন অনেক দূরের, পেছনে ফেলে আসা দিনে চলে গেছ। ষাট বছর বয়সের পর থেকে সব মানুষেরই এরকম হয়। অতীত আবার মনের মধ্যে ফিরে আসে। তাই আমি কিছু জিজ্ঞেসও করতাম না। কিন্তু মাসিমা তুমি যদি সারাক্ষণ ভেতরে ভেতরে এভাবে গুমরাতে থাকো, তাহলে তো কোনো ওষুধ কাজ করবে না। ভাঙা শরীর আরও ভাঙবে। এটা তো হতে দেওয়া যায় না। এই দু'বছরে আমি তোমাকে যতটা শ্রদ্ধা করেছি, ততটাই ভালবেসেছি মাসিমা। তোমাকে, তর্পণকে আপনজন বলে ভাবতে শুরু করেছি। তোমরাও আমাকে সেবিকা বলে ভাবোনি, পরিবারের একজন বলে ভেবেছ। যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছ। তাহলে তুমি কি আমাকে মেয়ে বলে ভাবতে পারো না? তোমার মনের সমস্ত কষ্ট থেকে মুক্ত হতে হলে একজন কাউকে বিশ্বাস করে চেপে রাখা সব কথা খুলে বলতে হবে, মাসিমা। আমাকে বলতে পারবে তুমি? বল? আমার কপালে আর চোখের নীচে শ্বেতী আছে বলে নার্সিং পাশ করেও কারও সেবায় লাগতে পারিনি। তুমিই প্রথম আমার শ্বেতী আছে দেখে ঘেন্না করনি, ভয় পাওনি। একজন নার্সকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে সেবার অধিকার দিয়েছ। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো মাসিমা। আমি কোনোদিন তোমার বিশ্বাস ভাঙব না।'

মালতীর কথা শুনে স্বস্তিকা একেবারে অভিভূত হয়ে

With Best Compliments from :

R. C. Bhandari

36, Basemant,
8, Camac street
Kolkata–700017

With Best Compliments From :

Parag Finance (P) Ltd.

36, Basement
8, Camac Street
Kolkata–700017

TRADE CENTRE (INDIA)

37, Lenin Sarani
Kolkata - 700 013

e-mail : t.c.india@vsnl.net

Fax : 91-33-2249, 8706
Ph. : 2249-8722

৫ বছরের
গ্যারান্টী
নির্মাতা

ISI-2347

KUMAR PLASTICS PVT. LTD.
১৯২, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০ ০০১
ফোন ঃ ২২২১-১৯৫১, ২২৪২-১৯৩০, ২২৪২-৫৪১০

পড়েন। তর্পণ থেকে সামান্য কয়েক বছরের বড় হবে মেয়েটা, তার মেয়ে কেন প্রায় নাতনীর বয়সী। মাত্র দুটো বছর দিবারাত্রি তার পাশে থেকে থেকে এত কাছের মানুষ করে নিয়েছে তাকে? কই, যারা রক্তের সম্পর্কে, নাড়ির সম্পর্কে একান্ত আপন ছিল তারা তো একবারও তার মন জানতে চাইল না? তার সামান্য একটা ইচ্ছার মূল্য দিল না? সেই ইচ্ছাটা খুবই অন্যায্য ছিল? সেই ইচ্ছাটাকে আকার দিলে কি ক্ষতি হতো? মোটেই কোনো ক্ষতি হত না বরং অনেক লাভ হতো। সম্পর্ক অটুট থাকত। সংসার সুন্দর হতো। ওরাও সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকত না। ঠিক যেমন ভয়ে ভয়ে এই বুঝি কিছু হলো, এই বুঝি কোনো বিপদ ঘটল, — এরকম দুশ্চিন্তায় তাকে কাটাতে হয়েছে।

চোখের দৃষ্টিতে বিশ্বাস নিয়ে স্বস্তিকা বলেন— 'আজ থেকে তুমি শুধু আমার নার্স নও, মেয়ে হলে। তোমার মেসোমশাইয়ের মৃত্যুর পর থেকে আমার কোনো বন্ধু ছিল না। সেই বন্ধুর আসনটাও আমি তোমাকে দিলাম। সব বলব তোমাকে। মনের বোঝা হাল্কা করে এবার থেকে প্রফুল্ল মনে থাকব। কথা দিলাম। আমি নিজেও বুঝি যে দায়িত্ব নিয়েছি হাতে সেটাকে সফল করার জন্য আমার সুস্থ থাকা প্রয়োজন।'

একপাশে মা অন্যপাশে দিদি, মাঝখানে পিলে শুতো মা'র বুকের সঙ্গে লেপটে। অনেক রাত— কত রাত সেটা পিলে বুঝত না। ঘুম চোখে একবার তাকিয়েই চাপবাঁধা জমাট অন্ধকার দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলত। কে যেন মাকে ডাকত খুব আস্তে আস্তে— 'এই! ওঠ্। চল। জলদি জলদি আ-যা। দশ রুপাইয়া মিলবে।'— মা পিলেকে আস্তে করে নিজের বুক থেকে সরিয়ে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিত দিদির দিকে। কেউ আসার শব্দ বুঝে মুরগিগুলো জালঘেরা ঘরটার ভেতরে একসঙ্গে কঁক্ কঁক্ করে উঠত। পাশেই বাঁশের বেড়ার খোয়াড়ে পাঁঠাগুলো ব্যাঁ ব্যাঁ করে ডেকে উঠত ভয় পেয়ে। তখন বুঝত না— এখন স্মৃতিগুলো নাড়াচাড়া করতে গিয়ে বোঝে ঐ পাঁঠা-মুরগিগুলো যখন তখন বলি দেবার প্রয়োজন হতো বলে স্টকে রাখা হতো। মুরগি ঘর আর পাঁঠার খোঁয়াড়ের মাঝখানে একটুকরো চিলতে জায়গা ধাবার একেবারে পেছনদিকে। তারপরই জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে নয়ানজুলিতে। অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ধান ক্ষেত, যেখানে মা, দিদি আর পিলে প্রাতঃকৃত্য সারতে যেত। দরজাবিহীন চিলতেটা মানুষের থাকার জায়গা নয়, কুকুর-বেড়াল হয়ত থাকতে পারে। রোদ-বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য টিনের চালাটুকুর তলায় আশ্রয় নিয়ে। কিন্তু পিলেরাও তো মানুষ ছিল না। কুকুর-বেড়ালের মতোই তো বে-আব্রু, দুদিক খোলা চিলতেটাতে রোদ-বৃ,টি থেকে মাথা বাঁচিয়ে নির্লজ্জ জীবনযাপন করেছে ওরা। অনেক রাতে তাইতো হাট্টা-গোট্টা ট্রাক ড্রাইভাররা খুল্লামখুল্লা তুলে নিয়ে যেত মাকে। প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন মা মিনি বেড়ালের মতো যেত ওদের পেছন পেছন ট্রাকের কেবিন ঘরে। এমনি করে মা যে কত অসংখ্যবার কত অজানা-অচেনা ট্রাকের কেবিন ঘরে যেতে বাধ্য হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। একবারই মাত্র ধাবার মালিকের কাছে প্রতিবাদী নালিশ নিয়ে হাজির হয়েছিল মা। আর সেটাই ছিল প্রথম এবং শেষ নালিশ। তেওয়ারিজী সব শুনে বলেছিল— 'হারামজাদী, সতীপনা দেখাতে এসেছিস? তোর বাপ কে ছিল বলতে পারবি শালী? তোর মেয়েটা আর ছেলেটার বাপের পরিচয় দিতে পারবি? পারবি না। কারণ এরা এক বাপের আওলাদ নয়। তোদের গুষ্টিশুদ্ধ হারামে জন্মেছে, তাই আচানক সতী মাইয়া হতে চাইছিস কেন? বেশ তো দশ-পাঁচ রুপাইয়া উপরি কামাই হচ্ছে।' বলে বিশ্রী ভাবে খ্যাক্ খ্যাক্ করে অনেকক্ষণ হেসেছিল তেওয়ারি, যেন এমন মজার কথা আগে কখনও শোনেনি। তারপরই আসল শয়তানটা বেরিয়ে এসেছিল— 'দ্যাখ, আমি ড্রাইভারদের কুছু বলব না। ওরা আমার লক্ষ্মী। ওদের সুবিধা দেখাটাই আমার কাজ। এখানে থাকা-খাওয়া-বেতন সব পাচ্ছিস তুই। তোর সঙ্গে তোর ছেলেমেয়েও শালা চারবেলা গিলছে বিনাপয়সায়। আজ নালিশ করেছিস, কাল আর নালিশ করবি না। যদি করিস তবে কাপড়া খুলে পিছুয়ারিমে লাথ মেরে নিকাল দেব। শালা ফালতু ঝামেলা বনাতী হ্যায় ঔর শিখায়ত লে কর আতি হ্যায়!' — গজগজ করতে থাকে তেওয়ারিজী।

তখন পিলে এসব কথা বুঝত না। কিন্তু বছর সাতেক বয়সে শোনা, দেখা, সব কথা দৃশ্যগুলো জাতিস্মরের স্মৃতির মতো ওর প্রখর স্মৃতিতে খোদাই করে লেখা হয়ে গিয়েছিল। তখন ও এটাও জানত না ঐ বিশেষ ধাবাটা যেখানে ওর মা মরল, যেখান থেকে দিদি হারিয়ে গেল, যেখানে কচি দুটো হাতে ফোস্কা ফেলে বড় বড় ভাতের ডেক্‌চি, হাঁড়ি, কড়াইয়ের ভেতরে ঢুকে বসে বাসন মাজতে হতো, যেখানে ওর শৈশবের নিষ্পাপ দিনগুলো অত্যাচারের অন্ধকারে ডুবে থাকত— সেই তিওয়ারিজী কা ধাবা-টা কোথায় ছিল। ও জানত না ঐ স্থান থেকে একটু এগিয়ে গেলেই কলকাতা নামে এক ঝলমলে মহানগরী আছে। সেই সময় ধাবার পরিধিটুকুই ওর কাছে গোটা পৃথিবী। এখন ও জানে ডানকুনির গায়ে ন্যাশনাল হাইওয়ের বাঁদিক ঘেঁষে ছিল 'তিওয়ারি কা ধাবা'।

একটামাত্র ধাবা ছিল তখন তাই তেওয়ারির গরমও বেশি ছিল।

মাকে, দিদিকে হারিয়ে, নিজের বাচ্চা দেহে মারের শতেক দাগ নিয়ে দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য তিওয়ারি ধাবা যে ওকে ঠাঁই দিয়েছিল, তার জন্য আজও ছেলেটা কৃতজ্ঞ হয়ে আছে। কারণ এখানেই ওর অন্ধকার জীবনে প্রথম আলোর প্রকাশ ঘটেছিল, নবজন্ম লাভ করেছিল পিলে নামের রুক্ষচুল, নোংরা শরীর, কালো মুখে কাজলকালো দুটো সুন্দর চোখের অধিকারী ঐ ছোট ছেলেটা। এখন বছরে দু-তিনবার ও যায় তিওয়ারি ধাবায়। বাল্যের স্মৃতি জড়ানো মা-দিদির শরীরের ঘেমো গন্ধ যেন এখনও ওখানকার বাতাসে মিশে আছে। জোরে শ্বাস টানলেই ও অনুভব করে সেই গন্ধ। তেওয়ারি কা ধাবার আগের রমরমা আর নেই। পথের দু'পাশে এখন আরও কয়েকটা গজিয়েছে বোম্বে রোড আর দিল্লি রোডের সঙ্গমে। তেওয়ারি বুড়ো হয়ে গেছে, ওর ছেলে ধাবা সামলায়। সঞ্চিত পাপক্ষয় করার সাধনায় ব্যস্ত মালিক তেওয়ারি সারাক্ষণ বসে বসে সুর করে তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করে। অনেকদিন আগে লাথি, জুতোপেটা করা 'পিল্লা'টাকে চিনতে পারে না তাই রামায়ণ পাঠ থামিয়ে সাদরে আহ্বান করে সেই তেওয়ারিজী— 'আইয়ে বাবুজী! আইয়ে আইয়ে, বোলিয়ে ক্যা লেঙ্গে? তড়কা, দাল, চাওল, চাপাটি, সব্জী, মটন, আণ্ডা, মছলী— সবকুছ মিলেগা। আরে ও রাকেশ! ইয়ে বাবুজীকো বৈঠাও, পানি-উনি পুছো তো বাবা! ক্যা লেঙ্গে দেখো।'

পিলে নামের ছেলেটা এখন লম্বা, স্বাস্থ্যবান, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখে গভীর দুটো কাজলদীঘি চোখ, সুন্দর শার্ট-প্যান্ট পরা এক তরুণ। তেওয়াজিরীর ওকে চেনবার কথা নয়। ও যে এখন আর পিলে নয়।

খাবারের ওর্ডার দিয়ে সুবেশ তরুণ ঘুরে ঘুরে চারিদিকে দেখে। ওকে পেছন দিকে যেতে দেখে তেওয়ারিজী চেঁচিয়ে ওঠে— 'আরে সাহাব, উদিকে যাবেন না। বহোত নোংরা আছে।'

তরুণ হাসিমুখে বলে— 'তা হোক। এরকম খোলা জায়গা আমার খুব ভাল লাগে।'

— 'আরে! খাসি রাখার খোওয়াড় আর মুরগা ঘর আছে উদিকে। বদবু শুঙ্গবেন নাকি? এখানে পাংখার নীচে বসুন।'

তরুণ কথা না বাড়িয়ে পেছনদিকে পা চালায়। একই রকম আছে জায়গাটা। শুধু খাসির খোঁয়াড়টা বাঁশের বেড়া ফেলে দিয়ে ইঁটের দেওয়াল হয়েছে। মাঝখানের চিলতেটাতে ঘুমন্ত অবস্থায় মাকে কিসে যেন কামড়েছিল। ওরা বলেছিল, সাপের কামড় নয়। মুরগির লোভে আসা ভাম, শিয়াল কিংবা মেঠো ইঁদুর হতে পারে। ছোট ছেলেটা দেখেছিল মা'র পায়ের খানিকটা জায়গার চামড়া-মাংসশুদ্ধ খোবলানো। রক্ত পড়ছিল দেখে দিদি কাঁদতে শুরু করেছিল। দিদির দেখাদেখি পিলেও কাঁদছিল। ওরা লাল রংয়ের একটা তরল ওষুধের ছোট শিশি দিদিকে দিয়ে বলেছিল— 'ওইখানটা ধুয়ে শুকনো করে মুছে এই ওষুধটা লাগিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দে।' বেঁধেছিল দিদি। তাতে কি হবে? দুপুরের মধ্যেই গনগনে লাল হয়ে ফুলে গিয়েছিল পা। আগুনের মতো তাপে জ্বলছিল মার শরীর। অজ্ঞান হয়ে দু'দিন পড়েছিল এই চিলতেতে পাতা ছেঁড়া মাদুরের ওপর। দিদি মালিকের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করে ব্যাগার্তা করেছিল— 'মালিক, মাকে একবারটি ডাক্তার দেখাও। অনেক জ্বরে বেহুঁশ হয়ে আছে, পা-টা কলাগাছের মতো ফুলে আছে লাল হয়ে। একটু দয়া কর মালিক, নাহলে মা যে মরে যাবে।'

তেওয়ারির সে কি হাসি! বিদ্রুপ করে বলেছিল— 'খেঁকি কুকুর— বেড়ালেরও কত শখ, এ্যাঁ! ডাক্তার ডাকো। ওরে ফুটপাথে জন্মানো হারামির জান অত সহজে যায় না। ডাক্তার কাকে বলে জানিস তোরা? কত টাকা খরচ হয় বুঝিস কিছু? কে দেবে পয়সা? এ্যাঁ!'

— 'মা-র মাইনে থেকে মাসে মাসে কেটে নিও মালিক। এখন মাকে বাঁচাও। তোমার পায়ে পড়ছি। দয়া কর।'

দিদি পাগলের মতো তেওয়ারির পায়ের সামনে মাটিতে মাথা কুটছিল।

— ' এই যা তো এখান থেকে। মাথা ধুইয়ে দে জল দিয়ে, জ্বর নেমে যাবে। কাজের সময় মাসোহাগীর ম্যালা ফ্যাচফ্যাচ শোনার সময় নেই আমার। যা ভাগ্।'

সেই রাতেই মা মরে গিয়েছিল। আর আশ্চর্য! দিদি একটুও কাঁদলো না। পাথরের মূর্তির মতো চুপ করে বসে রইল। দিদি কাঁদলো না দেখে পিলেও কাঁদলো না। ভাবল, বোধহয় মা মরে গেলে কাঁদতে নেই। আজ ওখানে দাঁড়িয়ে কাঁদল, তিওয়ারির পরম সমাদরের নতুন কাস্টমার।

— 'জানো মালতী, সপ্তর্ষি আর আমার লাভ ম্যারেজ হয়েছিল। এতবড় সেনগুপ্ত পরিবারের এক সুসন্তান ভালবাসলো এমন এক মেয়েকে যার নিজস্ব কোনো পরিবার নেই। জন্মের এক বছরের ভেতরেই যার বাবা-মার মৃত্যু হয়েছে। প্রথম সন্তান হেতু আর কোনো ভাই-বোনও যার

নেই। যে কখনও মামাদের কাছে, কখনও জ্যাঠা-কাকাদের কাছে ভাগাভাগি করে বড় হয়েছে। একান্ত আপন, একমাত্র নিজস্ব বলতে মেধাটুকুই যার সম্বল ছিল। তবে একথা বলতে পারব না যে মাতৃ-পিতৃহীন, অনাথই প্রায় বলতে পার— এই আমাকে যারা পালন করে বড় করেছেন তাঁরা খুব গঞ্জনা দিয়েছেন। না। স্নেহ-মমতা পেয়েছি আমি তাঁদের কাছে, আমার মেধার কদর করতেন তাঁরা তাই এতটা লেখাপড়া করতে পেরেছি। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি। ভালবাসার পুরুষটির সঙ্গে বিয়েতেও আপত্তি করেননি ওঁরা বরং বেহিসেবী হয়ে প্রচুর ঘটা-পটা করে বিয়ে দিয়েছেন। জানো, মালতী জীবনের ঐসময়টুকু ঈশ্বর সবসময় আমার পাশে ছিলেন। আর আমিও প্রবল বিশ্বাসে তাঁকে আঁকড়ে ধরে ছিলাম। কদাচিৎ কখনও আমার পালনকারীদের কাছ থেকে লাঞ্ছনা যদি পেয়েছি, তাতে ভেঙে পড়িনি। তৎক্ষণাৎ হয়ত দুঃখ হয়েছে, পরমুহূর্তেই ঝেড়ে ফেলে দিতেও দেরি হয়নি। যোগ-বিয়োগ করে দেখেছি, আমার প্রতি তাঁদের ব্যবহারে সুন্দর দিকটাই বেশি, বিশ্রী দিকটা অত্যন্ত নগণ্য। মনে হয়েছে, আমার তো বেঁচে থাকারই কথা নয়। কিন্তু ওঁরা মাতৃহীন তিনমাসের শিশুকে বাঁচিয়েছেন যত্ন করে। পিতৃহীন এক বছরের মেয়েটাকে অলক্ষ্মী, অপয়া বলে গালাগাল করেননি। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক সকলের চেয়ে ভালোটাই আমাকে দিয়েছেন। ভাল স্কুলে পড়ার খরচ জুগিয়েছেন। ন্যায়-অন্যায় বোধ জাগিয়েছেন, মানুষ-পশু-পাখির প্রতি মমত্ববোধ

Saraogi Udyog Private Limited

Importer, Merchants & Handling Agents
for Coal and Coke

21, Hemant Basu Sarani "Centre Point" Suit No. 212
2nd Floor, Kolkata - 700 001
Fax : +91-33-22435334, +91-33-22138782
Phone : +91-33-22481333 / 0674, +91-33-2213 8779/80/81
Email : saraogiudyog@eth.net; saraogi@cal2.vsnl.net.in
www.saraogiudyog.com

AVIMA EXPORTS (P) LTD.

Exporters of Quality Jute Goods & Rice

16, N. S. Road, (4th Floor)
Kolkata-700 001
Phone : 2242 9234 / 2262-2318 / 19
Fax : 2243 2659
e-mail : info@juteonline.com

সৃষ্টি করে আমাকে মানুষ নামের উপযুক্ত করে তুলেছেন। এঁরা যদি কখনও একটু দুর্ব্যবহার করেই ফেলেন তাহলে সেটুকু ইগ্‌নোর করাই ভাল, হয়ত আমারই কোনো কাজ তাঁদের উষ্মার কারণ? এভাবেই বিচার করে সারা জীবনটা চলেছি মালতী। ভাল কিছু হলে যোগফলটা ওঁদের ঘরে জমা করেছি, বিয়োগফলটা নিজের ঘরে। যে জন্য স্কুলে-কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে, হোস্টেলে, সর্বত্র বন্ধুদের কাছে আমি প্রিয় হতে পেরেছি। কারণ আমাকে কেউ অকারণ চড় মারলেও আমি তো পাল্টা চড় মারতেই জানতাম না। আমার অসীম সহ্যশক্তি, আমার মাত্রাতিরিক্ত বৈষ্ণববিনয়, সবাইকে খুশি রাখার চেষ্টা করা, এসব করতে গিয়ে নিজেরও খুশি থাকার যে দরকার আছে সেকথা মনে থাকেনি। আমার সবসময় মনে হতো যে মেয়ের বাবা-মা নেই সে কার কাছে নিজের ইচ্ছের কথা জানাবে? কার কাছে আবদার করবে? এটা আমার চাই-ই- চাই বলে জেদ করবে, রাগ দেখাবে? অন্যরা উপযাচক হয়ে যতটুকু করছে সেটুকুই তো যথেষ্ট পাওয়া। এর বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকাই উচিত নয়। কৃতজ্ঞ মনে সকলের খুশির জন্য নিজের সমস্ত খুশিকে চেপে রাখা উচিত। চাইতে পারার অধিকার দিতে রাজি আছে এমন কেউ যদি জীবনে কখনও আসে, সে বাবা-মার অভাব ভুলিয়ে দেবে— যে বাবা-মার চেয়েও বেশি কাছের, বেশি নিজের হবে। যার কাছে চাইবার অধিকার থাকবে তার কাছে চাইব। সে আমার সমস্ত অপূর্ণতা পূর্ণ করে দেবে। জন্মের পরেই অনাথ হয়ে যাওয়া, বাইরের লোকেদের মুখে শোনা— 'ও! স্বস্তির কথা বলছ? ও তো অনাথ মেয়ে। জানো না? ওর কেউ নেই। মামার বাড়ি আর বাপের বাড়ি মিলে ভাগাভাগি করে মানুষ করছে ওকে।' — এই কথাগুলো শুনে শুনে শৈশব থেকে মনের ভেতরে যে বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, সেই শূন্যতা একদিন একজন কেউ এসে অনেক ভালবাসা দিয়ে ভরিয়ে দেবে। আমার মাথার উপর স্বামী থাকবে 'নাথ' হয়ে। আর আমাকে অনাথ বলবে না কেউ।'

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে ক্ষীণজীবি স্বস্তিকা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আয়ুর্বেদিক তেল দিয়ে ওঁর কোমর মালিশ করছিল মালতী। হাত ধুয়ে এক গ্লাস জল এনে দিয়ে বলল— 'নাও খাও। অনেক কথা বলেছ, একনাগাড়ে। এখন আর বলতে হবে না। পরে আবার বলো।'

গ্লাসটা ফেরত দিয়ে স্বস্তিকা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন— 'আরে না-না। আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। এত যুগ ধরে একা একা বয়ে বেড়ানো বোঝাটাকে প্রথমবার নামাতে পারছি বলে ভাল লাগছে। আমাকে বলতে দাও মালতী। আর মালিশ করতে হবে না এখন। বস, ওই চেয়ারে, বসে শোন আমার জীবনকাহিনী। জানো, সপ্তর্ষি আমাকে খুব ভালবাসত, কিন্তু ওর কাছে আমার ভেতরের যন্ত্রণাটা প্রকাশ করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছি। মা-বাবা, দু-ভাই, দু-বোন মিলে আঁটোসাটো একটা নিখুঁত পরিবার। যেখানে ভাই-বোনে ঝগড়া হয়, চুলোচুলি-খামচা-খামচি করে রক্তপাতও ঘটায়, মা দৌড়ে এসে মেরে ধরে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঝগড়া থামায়। ছেলেমেয়েরাও পর মুহূর্তে নিজেদের ঝগড়া থামিয়ে আবার খেলতে শুরু করে। এভাবেই মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা আসে মনে, ভরসা জন্মায়। আমাদের বাড়ি, আমার বাবা-মা, আমার ভাই-বোন, আমার অধিকার! সপ্তর্ষির জীবনে এই সব কিছুর ওপর জন্মগত অধিকার ছিল, নিঃসঙ্কোচে দাবি করতে পারত। দাবি না মিটলে রাগ দেখিয়ে, নকল অভিমান করে দাবি আদায় করার স্বাধীনতা ছিল। আমার জীবনের জটিল মারপ্যাঁচ ওর বোঝার কথা নয়। তাই এসব শুনতেও চাইত না। বিরক্ত হয়ে বলত— থাক না ওসব পুরনো কথা। ওসব ভুলে যাও। বিয়ের পরও তুমি নিজেকে এমন দীন-হীন বলে ভাব কেন বলত? এখন তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, সবরকম স্বাধীনতা আছে। তুমি নিজে সফল, সাবলম্বী একজন মেয়ে যে একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। এখন তুমি কারও আশ্রিতা নও স্বস্তি! আমি আছি তোমার জীবনে, আমার পুরো পরিবার আছে তোমার পাশে। তুমি সেনগুপ্ত পরিবারের বৌ, সপ্তর্ষি সেনগুপ্তর স্ত্রী। সুখ যখন এসেছে তখন সেটা ভোগ করতে শেখো। পুরনো কাসুন্দী ঘেঁটে অযথা দুঃখ বিলাস করে কেন কষ্ট পাও বুঝিনা আমি। — সপ্তর্ষির কথায় যুক্তি থাকত, যা অস্বীকার করা যায় না। গাল পেতে চড় খাওয়ার মতো মেনে নিতেই হতো। আমারই তো দোষ! কেন সব থাকতেও সারাক্ষণ এত ইনসিকিওর্ড ফিল করি আমি? এই শহরের সেরা পরিবারে বৌ হয়েছি, সপ্তর্ষির মতো পণ্ডিত স্বামী পেয়েছি, নিজেও একটা ভাল চাকরি করি, সমাজে আমার নিজের যথেষ্ট মান মর্যাদা আছে। তবুও কেন আমি গর্বিত বোধ করি না? কেন অহঙ্কার আসে না মনে? কেন মনে হয় অন্য সকলের থেকে আমি অনেক নীচে পড়ে থাকা এক মেয়ে সকলের নজরে যে একজন করুণার পাত্রী। বাড়ির কাজের লোকদের খুশি রাখার দায়টাও আমি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি কেন? আমি এবাড়িতে আসার আগে থেকেই ওরা ছিল। ওরা বকাঝকা শুনতে অভ্যস্ত। রায়বাঘিনী বড় ননদ ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়িতেই পড়ে থাকেন বছরে এগারো মাস। একই শহরের অন্যপ্রান্তে তার শ্বশুরবাড়ি। ননদাই প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় বৌ-ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে এসে জামাই আদর খেয়ে যান শ্বশুরবাড়ির কাছে। এবাড়ির কাজের লোকদের পান থেকে চুন খসলে ননদ মুখেমুখেই ওদের ছাল ছাড়িয়ে দেন। মা তো কিছুই বলেন না আদরের বড় মেয়েকে বরং প্রশ্রয়ই দেন। আশ্চর্য লাগত যখন

ননদাইয়ের মতো একজন শিক্ষিত মানুষকে দেখতাম ননদের রুমে দরজা বন্ধ করে নিভৃতে থাকতেন অনেকক্ষণ। স্ত্রীর বাপের বাড়িতে দাপটের সঙ্গে থাকার ব্যাপারে কখনও ভর্ৎসনা করতেন না। আমি দু-তিন মাস এসব লক্ষ্য করার পর মাসে দুটো রবিবার দুপুরের কাজ শেষ হবার পর কাজের লোকদের বিকেল বেলাটা ছুটি ঘোষণা করে দিলাম। এ নিয়ে অবশ্য কেউ আমাকে বিশেষ কথা শোনায়নি, শুধু শাশুড়ি জিজ্ঞেস করেছিলেন— 'সন্ধের সময় তো জলখাবার, রাতের খাবার, জামাইবাবাজীর আপ্যায়ন এসব ভারী কাজগুলো থাকে, এখন এগুলো কে করবে স্বস্তি?'

বলেছিলাম— 'মাসে দুটো দিন আমিই করব মা। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। রোববার তো ছুটির দিন। আমি সামলে নেব, আপনি ভাববেন না।'— মুখে কিছু না বললেও মনে মনে যে মা-মেয়ে খুশি নন সেটা বুঝেছিলাম। সপ্তর্ষি তো খুব রেগে গিয়েছিল— 'পরের উপকার করতে গিয়ে নিজের পায়ে তোমার মতো বোকা মেয়েরাই কুড়ুল মারে। কি দরকার ছিল এসব বদান্যতা করার? তুমি কি নিজের সুখের কথা ভাবতেই শেখোনি?'

আমি হেসে উত্তর দিয়েছিলাম— 'তুমিই তো একদিন বলেছিলে— অধিকার কেউ কাউকে হাতে তুলে দেয় না। নিজের বুদ্ধি দিয়ে অধিকার অর্জন করতে হয়। এবাড়িতে আমার অধিকার অর্জনের এটাই প্রথম প্রচেষ্টা মনে করছ না কেন?'

ও রেগে গিয়ে বলেছিল— 'খুব বুঝেছি। রোববারগুলোতেই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে কোথাও যাওয়ার সুযোগ হয়, সেটাকেই বারোটা বাজিয়ে দিলে। নাও, এখন তিনটে কাজের লোকের কাজ একা কর প্যাচপ্যাচে ঘেমো শরীর, ঘাড় গলায় থিকথিকে ঘামাচি নিয়ে আমার কাছে আসবে না বলে দিলাম।'

খুব হাসি পেল ওর বলার ঢং দেখে। বললাম— 'আসব না। কমলা মাসিকে বলব ওর ঘরে আমার জন্য একটা বিছানা পেতে রাখতে।'

ও খুব রেগে গেছে। বলল— 'তাই কর।'

এমনি করেই আস্তে আস্তে আমি অতীতের দুঃখবিলাসকে ত্যাগ করার চেষ্টায় বর্তমানকে আঁকড়ে ধরে সেনগুপ্ত বাড়ির বৌয়ের অধিকার অর্জন করতে লাগলাম। পান থেকে চুন খসার কারণে বড় ননদের হম্বিতম্বি অগ্রাহ্য করে ঝি-চাকরের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে লাগলাম। ননদকে বুঝিয়ে বলতে লাগলাম কখন ওরা সত্যিই অন্যায় করেছে আর কখন বিনা অপরাধে উনি ওদের শাস্তি দিচ্ছেন। বোঝালাম, এভাবে চলতে থাকলে ওরা হয়ত কাজ ছেড়ে চলে যেতে পারে। ওরা অন্য বাড়িতে কাজ পেয়ে যাবে, কিন্তু আমরা ওদের মতো বিশ্বস্ত লোক আর নাও পেতে পারি। একথাও পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলাম যে, রবীন্দ্র ভারতীর লেকচারারের চাকরিটা ছেড়ে আমার পি এইচ ডি -টাকে অপমান করে ঘরে বসে থাকা একেবারেই অসম্ভব। আকারে ইঙ্গিতে বাংলা ভাষার মোলায়েম শব্দ ব্যবহার করে অনেক চালাকি করে জামাইবাবুর বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না হৃদয় বেদনার ব্যাখ্যান করতে লাগলাম। — 'আহা, বেচারা জামাইবাবু তোমাকে না দেখে থাকতে পারেন না বড়দি। তা না হলে প্রত্যেকদিন এখানে আসতেন? বল? একজন পুরুষের জীবনে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মারার সুখটা কম বড় নয়। কিন্তু জামাইবাবু তোমাকে আর ছেলেমেয়েকে দেখবার জন্য নিজের অন্যান্য ইচ্ছেগুলোকে জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠিত হন না। আমি এই কারণেই ওঁকে এত শ্রদ্ধা করি, জানো? বড়দি, তিনি তাঁর মনের কথা তোমার কাছে বলতে পারেন না, পাছে তুমি কষ্ট পাও। ওঁর এত ভালবাসার প্রতিদানে তোমারও তো কিছু দেওয়া উচিত, বল? দেখেছ তো তোমার ভাই বাড়িতে থাকলে ক্ষণেক্ষণে আমাকে ডাকে! বলে— এটা পাচ্ছি না, ওটা কোথায়? এগুলো সব ছুতো বুঝলে? মদ্দা কথা হল সারাক্ষণ আমার সান্নিধ্য পেতে চায়। সব স্বামীই এটা চায় বড়দি, জামাইবাবুও সারাক্ষণ তোমার সান্নিধ্য চান, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। সপ্তর্ষি যেমন মুখ ফুটে একথা বলে, জামাইবাবু চাপা স্বভাবের মানুষ বলে মুখ ফুটে বলতে পারেন না। তিনিও হয়ত তোমার ভাইয়ের মতো অফিসে বের হবার আগে আশা করেন তুমি পাশে থাকবে, রুমাল, চশমা, ঘড়ি, মানিব্যাগ, গাড়ির চাবি— সবকিছু গুছিয়ে হাতে ধরিয়ে দেবে। বেরোবার আগে তিনি তোমাকে একটু আদর করে হাসিমুখে বেরোলেন। কিন্তু ওঁকে নিজের হাতে সব খুঁজেপেতে নিতে হয়। বেরোবার আগে প্রত্যেকদিন বুড়ো বাবা-মা ছাড়া আর কেউ থাকে না, বাড়ি ফিরেও সেই বাবা আর মা। তাঁর পরিশ্রান্ত শরীরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ভালবাসা মানুষটা অপেক্ষা করে থাকে না ঘরে ফেরার পর। বড়দি, আমি এসব বলছি বলে রাগ করছ না তো? আসলে কি জানো— তোমার কাছ থেকে বাবা-মার কাছ থেকে এত স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে আমি তোমাদের ভালমন্দের সঙ্গে নিজেকে মনেপ্রাণে জড়িয়ে ফেলেছি গো! এতকাল মামাদের জ্যাঠা-খুড়োদের আশ্রয়ে পালিত হয়ে এই প্রথম নিজের বাড়ি, নিজের সংসার পেলাম। বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের সবাইকে সুখে রাখতে চাই। খুশি আছো, এটাই দেখতে চাই। এর বেশি কিচ্ছু চাই না আমি। আমাকে ভুলে বোঝো না প্লীজ! তোমার আর জামাইবাবুর মধ্যে ঝগড়া নেই, অশান্তি নেই বরং গভীর ভালবাসা আছে লক্ষ্য করেছি আমি। আলাদা থাকবে কেন তোমরা? একসঙ্গে থাকার সুখটা থেকে কেন বঞ্চিত

করবে নিজেকে, বল? এমন তো কিছুই বয়স নয় যে মেরিটেল রিলেশনশিপের প্রয়োজন নেই আর? জামাইবাবুর কথা ভাবো বড়দি। মানুষটা ঘুম থেকে উঠে তোমার মুখ দেখলে ওর দিনটা ভাল কাটবে। আচ্ছা, উনি এবাড়িতে চলে আসতে পারেন না? তাহলেই তো ল্যাঠা মিটে যায়। একসঙ্গে থাকতে পারবে দু'জনে!'

ননদ এতক্ষণ পর মুখ খোলেন— 'দূর। তুমি কি মনে কর একথা বলিনি আমি ওকে? অনেক বলেছি। আসবে না বাবা-মাকে ছেড়ে। তাছাড়া এখানে থাকলে লোকে ঘরজামাই বলবে, সেটার ইগো বেশ ভালই আছে। আমারই হয়েছে জ্বালা। শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা। দেখো, আমি বিয়ের আগে কোনো ঘরের কাজ করিনি এবাড়িতে। ঘরের কাজ করতে আমার ভাল লাগে না। শ্বশুরবাড়িতে কিছু না কিছু কাজ তো করতেই হবে। শাশুড়ি নিজে রান্না করেন। আমার বিয়ের পর রজত রান্নার লোক রেখে দিল কিন্তু শাশুড়ির সেই রান্না পছন্দ নয়। ছাড়িয়ে দিলেন বৌটাকে। জানো, এখনও উনি পঁচাত্তর বছর বয়সেও নিজে রান্না করেন। যত রাজ্যের হাবিজাবি যেমন— নটেশাক, নানারকমের বড়াভাজা, থোড়, মোচার ঘণ্ট, এসব খেতে ভালবাসেন। আসলে উনি এত সেকেলে যে এযুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চান-ই না। আশা করেছিলেন আমি ওসব রান্নাগুলো শিখে দু-বেলা ফ্রেশ রান্না করে খাওয়াবো। দেখো স্বস্তি, তোমার জামাইবাবু কেরানি নন, উনি একজন হাই-ফাই সরকারি অফিসার। একটা ভাল রান্নার লোক রাখার ক্ষমতা ওর আছে। কিন্তু মা-র জেদের জন্য আর মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখানোর জন্য ওকে ভুগতে হচ্ছে। শাশুড়ি আমাকে দেখতে পারেন না, তবে শ্বশুর ওরকম নন। উনি মুখবোজা মানুষ, শাশুড়ির বাতিক সহ্য করে নিজেকে ঝামেলা থেকে সরিয়ে রাখেন। আমাদের সেনগুপ্ত বাড়ির সঙ্গে আমার শাশুড়ির কালচারের আকাশ-পাতাল তফাত, স্বস্তি। তোমার মতো ধৈর্যশীল মেয়েও ওবাড়িতে দু'দিনও টিকতে পারবে না, আর আমার তো ধৈর্যই নেই।'

রয়েসয়ে বড়দির পক্ষ টেনে বলি— 'এবার বুঝতে পারছি তোমার প্রবলেমটা কোথায়। আচ্ছা বড়দি, ওদের দু'জনকে কোনো নামকরা ওল্ড এজ হোমে পাঠিয়ে দেওয়া যায় না? ইনিশিয়াল ডিপোজিট মানিটা শুনেছি পার-পারসন পাঁচ লাখ টাকা রাখে। তবে এটা রিফান্ডেবল। মান্থলি খরচও সাধারণ হোমগুলোর চেয়ে বেশি। কিন্তু ওরা বিদেশের মত সব সুবিধাযুক্ত হোম বানিয়েছে। খাওয়া-থাকা অত্যন্ত উঁচু মানের বলে শুনি। প্রত্যেকদিন স্পেসালিস্ট ডাক্তাররা ভিজিট করেন নাকি। এটা কি রকম হবে? ভাল না মন্দ?'

বড়দি বলল— 'আমাদের জন্য তোমার কনসার্ন দেখে আজ আবার নতুন করে চিনলাম তোমাকে। তবে, এই যুক্তিটা খবরদার তোমার জামাইবাবুকে বলতে যেও না। তাহলে তুমি ওর শত্রু হয়ে যাবে, বুঝেছ? ছোট শালার বৌ বলে রজতের

Office- 2236-5330/1594
Shop- 6534-9088
2838-1039
Resi.- 24988912

ELEGANT STORES

PAINTS

Paints & Ancillaries of Elga Paints and Polymers, Akzo Nobel - ICI, Kansai Nerolac Shalimar

HARDWARE

Locks. Lubricating Oil, Grease and other Hardware

ADVICE ON INTERIOR DECORATION
S.T.D / I.S.D / PAY PHONE

33, Tollygunge Circular Road.
Kolkata-700 053

With Best Compliments

From :

A
Well
Wisher

(S.F)

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

বেনারসী, সিল্ক, তাঁত শড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রিয় গোপাল বিষয়ী ®

স্থাপিত - ১৮৬২

বড়বাজার ঃ ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা - ৭,

ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৪০২, ২২১৮ ০৩৪৮

২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭, ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৫০৮

গড়িয়াহাট ঃ ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে,

কোলকাতা - ৭০০ ০২৯, ফোন ঃ ২৪৬৫-৮২৪৬

এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই

কাছ থেকে যে আদরটা পাচ্ছ সেটা নিমেষে ভ্যানিশ হয়ে যাবে গো সুন্দরী।'

বিয়ের পর সেদিনই প্রথম ননদের সঙ্গে খোলাখুলি এত আলোচনা হলো ওদেরই সমস্যা নিয়ে। বড়দি বেশ খুশি হয়েছেন বুঝতে পারলাম। কারণ, কথা বলার সময় আমি অনেক জায়গায় অনধিকার চর্চা করেছি জেনেশুনেই। বড়দির মন জানার জন্য। দেখলাম উনি এসব গায়ে মাখলেন না, বরং তাঁর আর রজত দাশগুপ্তর দাম্পত্য জীবনের সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করি জেনে খুশিই হলেন। এরপর মাঝে মাঝেই সময় পেলে আমাদের দু'জনের অন্তরঙ্গ বৈঠক হতো। মাস দুয়েকের মাথায় একদিন রাত্রে ডাইনিং টেবিলে রজত দাশগুপ্ত ঘোষণা করলেন, — 'বাবা, সুতপাকে এবার ওবাড়িতে নিয়ে যাবো ঠিক করেছি। অনেক বছর এখানে রয়েছে, এটা আমার পক্ষে আর মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আত্মীয়-স্বজন তো প্রশ্ন করেই, এখন বন্ধু-বান্ধবরাও আকারে প্রকারে নানারকম মন্তব্য করছে। তাই মঙ্গলের ঊষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা— ক্ষণার এই বাক্য ফলো করে বুধবার রাত্রেই শ্বশুরবাড়িতে সুতপার আবার গৃহপ্রবেশ হবে। আপনার মেয়ে নিজেই ওবাড়িতে ফিরে যেতে চায়।'

শ্বশুর-শাশুড়ি দুজনেই দেখলাম খুশি হয়ে বললেন— 'সে তো খুব আনন্দের কথা। ও ওর নিজের বাড়ি ফিরে যাবে তাতে আমাদের আপত্তি কেন হবে?'

সপ্তর্ষি মনযোগ দিয়ে মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বলল— 'থ্যাঙ্ক ইউ বড়দি। শেষকালে তোর যে রজতদার জন্য মনটা হু-হু করে উঠেছে, আমি তাতেই ধন্য। তবে রজতদা বুধবারের আগেই একটা উড়ে বামুন জোগাড় করতে পারবে তো যে বকফুল, সজনে ফুল, কুমড়ো ফুলের বড়া বানাতে জানে? তা না হলে তোমাকে আবার পুনর্মুষিক ভব হতে হবে কিন্তু!'

রজত বলে— 'ওরে সে কি আর জানি না? হাড়ে হাড়ে জানি। জোগাড় হয়েছে। একজন মহিলা পাওয়া গেছে, যিনি ক্যাটারারদের কাছে কাজ করেন। ইনি কেবল বড়া, ঘণ্ট এসব নয়, পাটশাকে গাঁট মেরে ভেজে কাঁঠাল বিচির তরকারিও বানাতে জানেন রে। একেবারে নিখাদ পূর্ববঙ্গীয়, নিঃসন্তান বিধবা। বয়স ঊনপঞ্চাশ। আমার মা মহিলার ইন্টারভিউ নিয়ে ঠিকুজী-কুলুজী, বংশতালিকা মায় পুরো ইতিহাস জেনে তবেই রাজি হয়েছে। বেড-টি থেকে শুরু করে রাতের ডিনার সব তিনি একাই করবেন। কাউকে হাত লাগাতে হবে না। ক্যাটারিং সার্ভিসের কাজ পাকা নয়, যখন দরকার তখন ডাকে। নগদ বিদায় দিয়ে পরে আবার ডাকবে বলে। এভাবে মহিলার জীবন চালানো মুশকিল হচ্ছিল। তিনি একটা ভদ্র পরিবারে থাকা-খাওয়া দেবে, মাসমাইনেও দেবে এমন কাজের সন্ধান করছিলেন। যাই হোক, উনি বলেছেন, তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমরা যদি আশ্রয় দিই তাহলে বাকি জীবন এবাড়িতেই থেকে যাবেন।'

— 'আমিও ইন্টারভিউতে ছিলাম উপস্থিত, বুঝলি? পরনের শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ, মাথার তেল, গায়ে মাখার একখানা করে সাবান, কাপড় কাচার গুঁড়ো সাবান— মাত্র এটুকুই ওর চাহিদা। মাইনে মাসে তিন হাজার টাকা। আমি মাকে থামিয়ে দিয়ে ওর শর্ত মেনে গতকাল ওকে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়েছি। কি! ঠিক করেছি কি না?'

সপ্তর্ষি বলল— 'আলবাত ঠিক করেছ কোনো সন্দেহ নেই তাতে। তবে মা-লক্ষ্মী যাতে শান্তিতে টিকে থাকেন এদিকটা বড়দির ওপর ছেড়ে দাও। ও যা বকাবকি করে! বাপরে বাপ! এই সুখটুকু হারানোর ভয়ে যদি ওর হামলাবাজি বন্ধ হয় সেটা আমাদের এবং বিশেষ করে তোমার উপরি লাভ রজতদা।'

ননদ খুশি মনে শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেলেন। যাবার আগে শাশুড়িমাকে কি করে বসে আনতে হয় তার কিছু মন্ত্রগুপ্তি দিয়ে দিলাম আমার সঙ্গে আমার শাশুড়িমার বন্ধুত্বপূর্ণ উদাহরণের কিছু নমুনা দিয়ে। নিজের মা-র প্রশংসা শুনে কোন মেয়ে না খুশি হয় বল? ননদ খুব খুশি হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। বললেন— 'তোমার মতো বৌ যদি ঘরে ঘরে থাকত, তাহলে সব সংসার সুখের হতো। আমি বয়সে তোমার চেয়ে অনেক বড় হয়েও কত অবুঝ ছিলাম। বিবাহিত হয়ে, এত ভাল স্বামী পেয়ে, শ্বশুরবাড়িতে টাকা-পয়সার অভাব না থাকা সত্ত্বেও আমি শুধুমাত্র নিজের আরামের কথা ভেবে বাপের বাড়িতে থেকেছি এতগুলো বছর। সমাজের কাছে বাবার, রজতের, শ্বশুরের মান নষ্ট করেছি। তুমিই প্রথম আমার চোখ খুলে দিয়ে দেখালে আমি কীভাবে আমার নিজের ডিগনিটিও হারিয়ে ফেলেছি। ছেলেমেয়ে দুটো বড় হয়েছে। ওরাও হয়ত মা-র বাপের বাড়িতে থাকা পছন্দ করে না। মনে মনে ওরা হয়ত আমাকে অনুকম্পা করে। স্বস্তি, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। আমি নিজের সংসারে ফিরে যেতে চাই শুনে রজত প্রথমে ভেবেছিল এখানে হয়ত তোমার সঙ্গে আমার বনাবনি হচ্ছে না। কিন্তু যখন শুনল আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরে, বৃদ্ধ বয়সে শ্বশুর-শাশুড়ির অসহায় অবস্থার কথা ভেবে ফিরে যেতে চাইছি, তখন আনন্দে ও ইমোশোনাল হয়ে পড়েছিল, ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ও শুধু একটা কথাই বলতে পেরেছিল— ঘরে ফিরে এসো সুতপা।'

বড়দি ফিরে যাওয়ার পর আমি মা হতে চলেছি বুঝতে পারলাম। সে যে কি অপূর্ব অনুভূতি বলে বোঝানো যায় না,

মালতী। সেনগুপ্ত বাড়িতে খুশির বান ডেকেছে। মোস্ট ইগো সেনট্রিক মানুষ সপ্তর্ষি ইগো-ফিগো ভুলে গিয়ে এককথায় আমার সব কথা মেনে নেয় বিনা আর্গুমেন্টে। কথায় আছে না— হোয়াট ম্যান প্রপোজেস গড ডিসপোজেস? দু'মাসের মাথায় বজ্রপতন হলো। অকারণেই আমার মিস্‌ক্যারেজ হয়ে গেল। আশাহত পরিবার আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নিজেদের দুঃখ ভুলে আমাকে চাঙ্গা করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে রইল। সপ্তর্ষি আমাকে হাসিয়ে-টাসিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও ওর ভেতরের কষ্টটা আমার নজর এড়াতো না। ডাক্তারও বললেন, ভয়ের কারণ নেই। অনেকেরই একবার-দুবার মিস্‌ক্যারেজ হয় যার বিশেষ কোনো কারণ থাকে না। আমার ওভারিতেও এমন কোনো ফল্ট নেই, সুস্থ স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম আমি। তিন-চার মাসের মধ্যে সম্ভবত আমি আবার কনসিভ করব। কিন্তু আমার মনে শান্তি ছিল না। কোনো ফল্ট নেই, তাহলে কেন এত আশায় জ্বালানো প্রদীপটা নিভে গেল? যে ঈশ্বরকে আশ্রয় করে আছি আমি তাঁর আমার প্রতি এ কেমন বিচার? জীবনে জ্ঞানত কোনো পাপ করেছি বলে মনে পড়ে না। তবে এ কিসের শাস্তি? আমার রক্তের বন্ধন যাদের সঙ্গে ছিল তাদের তো চোখ ফোটার আগেই কেড়ে নিয়েছিলেন। এখন নাড়ী ছিঁড়ে প্রথম সন্তানটিকেও কেড়ে নিয়ে কিসের পরীক্ষা করছেন তিনি? ঈশ্বর সত্যিই আছেন নাকি তিনি দুর্বল মানুষের বিশ্বাস থেকে সৃষ্ট এক মায়াজাল মাত্র? এই সন্দেহ আমার মনে বাসা বাঁধল। বিশ্বাসে ফাটল ধরতে শুরু করল। সন্দেহের দোলাচলে দুলতে লাগলাম। তিনমাসের মধ্যেই দ্বিতীয়বার কনসিভ করলাম। এবার আগে থেকে কেউই উল্লাস প্রকাশ করল না বরং দুশ্চিন্তার ভাঁজ কপালে নিয়ে প্রার্থনা করতে লাগল। আমি প্রার্থনাও করতাম না। কার কাছে প্রার্থনা করব যে আমাকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা খেলে চলেছে, তার কাছে? —স্বস্তিকা আঁচল দিয়ে চোখ মুখে জলটাকে গালে গড়াতেই দিলেন না। গ্লাস তুলে পুরো জলটা খেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। মালতী এতক্ষণ ধরে একবারও কোনো বাধা দেয়নি, কোনো প্রশ্ন করেনি। নীরব শ্রোতা হয়ে বসে আছে। ও জানে আজ যে উৎসমুখ খুলে কথার স্রোত স্পনটেনিউয়াসলি বেরিয়ে আসছে মাসিমার বুক হাল্কা করে, কাল তা নাও ঘটতে পারে। ওঁকে বলতে দিতে হবে। কেমন যেন বেদনার ছাপ তাঁর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন বাইরের দিকে। কিন্তু কিছু যেন দেখছিলেন না। আসলে চোখ বাইরে ছিল ওঁর দৃষ্টি ছিল হৃদয়ের গভীরে। — 'জানো, তিনমাস নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেল। সপ্তর্ষি আমাকে আর বাসে চড়ে রবীন্দ্র ভারতীতে যেতে দেয় না। আমার ক্লাশ দুপুরে থাকলেও ও গাড়িতে করে দশটার সময় নিজের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে রবীন্দ্র ভারতীতে পৌঁছে দেয়। ফেরার সময়ও ট্যাক্সি করেই আসতাম রোজ। তবুও ঘটল আবার দুর্ঘটনা। চার মাস পূর্ণ হবার মাত্র কয়েকদিন আগে আবার খসে গেল আকাশের নক্ষত্র। এবার ফিটাস রক্তের ঢেলা নয়, হিউম্যান আকার নিয়ে নিয়েছে ছোট্ট একটা পুতুল। চোখ নাক, হাত-পা, জেনিটলে আবছা ভাবে গঠন হয়ে গেছে। ছেলে ছিল।

এবার পেটে ব্যথা ছিল না, ব্লিডিং ছিল না, এ্যাবর্সনের কোনো সিম্পটমই ছিল না। প্রায় তিন ইঞ্চির পুতুলটা নিজে থেকেই বাথরুমের মেঝেতে খসে পড়েছিল। এর গায়ে একফোঁটা রক্তও লেগে ছিল না। আমার অসমাপ্ত অবয়ব পুতুল ছেলেকে নিজের হাতে বাথরুমের মেঝে থেকে তুলে নিয়ে শাশুড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম বোবা চোখে বোবা মুখে।

এবার আর কারও সান্ত্বনাতেই কাজ হলো না। ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিলাম। চাকরি থেকে লম্বা ছুটি, চারপাশের চলমান জগৎ থেকে লম্বা ছুটি। একটা অন্ধকার কুঠুরির ভেতরে তিন ইঞ্চির নিষ্প্রাণ পুতুল ছেলেকে নাওয়ায়-খাওয়ায় খেলা করে। আমি শ্বশুর-শাশুড়িকে চিনি না, সপ্তর্ষিকে চিনি না, নিজেকেও চিনি না। চিনি শুধু ঐ পুতুলটাকে।

প্রায় পাঁচ মাস চিকিৎসা আর অসীম ধৈর্য নিয়ে সপ্তর্ষির সেবা-যত্নে ধীরে ধীরে সুস্থ মানসিকতা ফিরে পেলাম। কাজে জয়েন করলাম, সংসারে মনোনিবেশ করলাম— কিন্তু পুতুল ছেলে আমার মন থেকে কখনোই পালিয়ে গেল না। আজও সে বেঁচে আছে এখানে— বলে স্বস্তিকা নিজের বুকে হাত রাখলেন।

সপ্তর্ষিকে বলেছিলাম— 'আমি আর সন্তান চাই না। মৃতবৎসা হওয়ার অভিশাপ আমাকে পাগল করে তুলছে সপ্তর্ষি। তুমি বরং আমাকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে বিয়ে কর।'

সপ্তর্ষি বলেছিল— 'এটা মডার্ন টেকনোলজির যুগ স্বস্তি। মৃতবৎসা শব্দটাই অনর্থক এখন। এসব সেকেলে কথা তোমার মুখে মানায় না। সন্তান আমাদের হবেই আর আমার সন্তান তোমার গর্ভ থেকেই জন্ম নেবে। স্বাভাবিক ভাবে না হলে আর্টিফিশিয়ালি হবে। আমি আশাবাদী মানুষ জানো তো তুমি। একটু ধৈর্য ধর। প্লীজ, আর ভেঙে পড়ো না লক্ষ্মীটি। আশা ছেড়ে দিও না।'

মালতী দেখে স্বস্তিকার মুখে রেখা থেকে আস্তে আস্তে দুঃখের ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে। মৃদু হাসি ফুটে উঠছে ঠোঁটের কোণায়। ম্লান দুটো চোখে আলোর আভাস। স্বস্তিকা আবার বলতে লাগলেন— 'দেড় বছর পর সুহাগ এলো জীবনে।

সুস্থ-স্বাস্থ্যবান সাড়ে দশ পাউন্ড ওজন। নর্মাল ডেলিভারির চান্সই নিলেন না ডাক্তার। সিজারিয়ান সেকশন করে জন্ম নিল আমার রক্তে-মাংসে, শ্বাস-প্রশ্বাসে সৃষ্ট হওয়া আত্মজ। সে যেন অমতৃস্য পুত্রের মতো এক কলস ভরা অমৃতকুম্ভ নিয়ে এলো সেনগুপ্ত পরিবারের জন্য। সপ্তর্ষি কৌতুক করে বলল— এবার ভাবছি মৃতবৎসা বৌটাকে ডিভোর্স করে একটা সবৎসা গাভী কিনে নিয়ে আসব।'

সুহাগ আমার নিজের, আমার আত্মপরিচয়। আর আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি তখন আত্মগ্লানি মুক্ত সম্পূর্ণ নতুন এক স্বস্তিকা। সপ্তর্ষির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সুহাগকে গড়ে তুলছি আমরা। ছেলে একটা করে পরীক্ষায় কৃতী হয়ে যশলাভ করে আর আমার চিরকালের নিরহঙ্কারী মনে অহঙ্কার বোধ এসে ঘর বানায়। এমনি করেই একদিন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজি সাহিত্যে পি এইচ ডি করে বেরিয়ে আসে সুহাগ সেন— আমাদের ছেলে। এখন আমার আঁচলের গিঁট খুলে সে সুদূর ইংল্যান্ডে চলে যাবে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে। রক্ষা হয়েছে যে বিদেশে থেকে যাওয়ার মোহ ওর একেবারেই নেই। মোহ শুধু অক্সফোর্ডে পড়ার। ফিরে এসে নিজের দেশেই পড়াতে চায়। বাবা-মার মতো শিক্ষাব্রতী হতে চায়। আমরা জানতাম, সুহাগ একদিন দেশের নামকরা একাডেমিশিয়ান হবে। সেনগুপ্ত পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবে। আমাদের স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে মালতী। ডঃ সুহাগ সেনগুপ্ত, হেড অফ দ্যা ডিপার্টমেন্ট ইংলিশ, ইউনিভার্সিটি অফ ডেল্লী। শুধু একজন একাডেমিশিয়ান নয়, নামকরা নিউজ পেপারের কলামিস্ট, লেখক এবং কবি। শুধু যদি...

তেওয়ারি এখন বুড়ো হয়ে গেছে। ও জানত পুঁটি আর কোনোদিন ওর ভাই পিলের কাছে ফিরে আসবে না। বোকাসোকা ভীতু মেয়েটা এই ধাবার বাইরেই পা রাখেনি কখনও সে কি করে কোনো না কোনো অজানা জায়গা থেকে ফিরবে? এতদিনে হয়ত পনের বছরের মেয়েটা বড় হয়েছে। না-জানি কত হাত বদল হয়ে কত বাজারে বিক্রি হয়ে গেছে। রামজী জানেন, তেওয়ারি ওদের যতই খাটাক, যতই অশ্রাব্য গালাগাল দিক তবুও ওর অন্তরে মেয়েটার জন্য আজকাল বড় অনুশোচনা হয়। হাজার হলেও চোখের সামনে ছোট থেকে বড় হতে দেখেছে পুঁটিকে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছে ওইটুকু মেয়ে। ছোট ভাইটাকে বুকে আগলে রেখেছে। কোন শালা হারামীর বাচ্চা ট্রাক ড্রাইভার ওকে নিয়ে পালালো? যদি

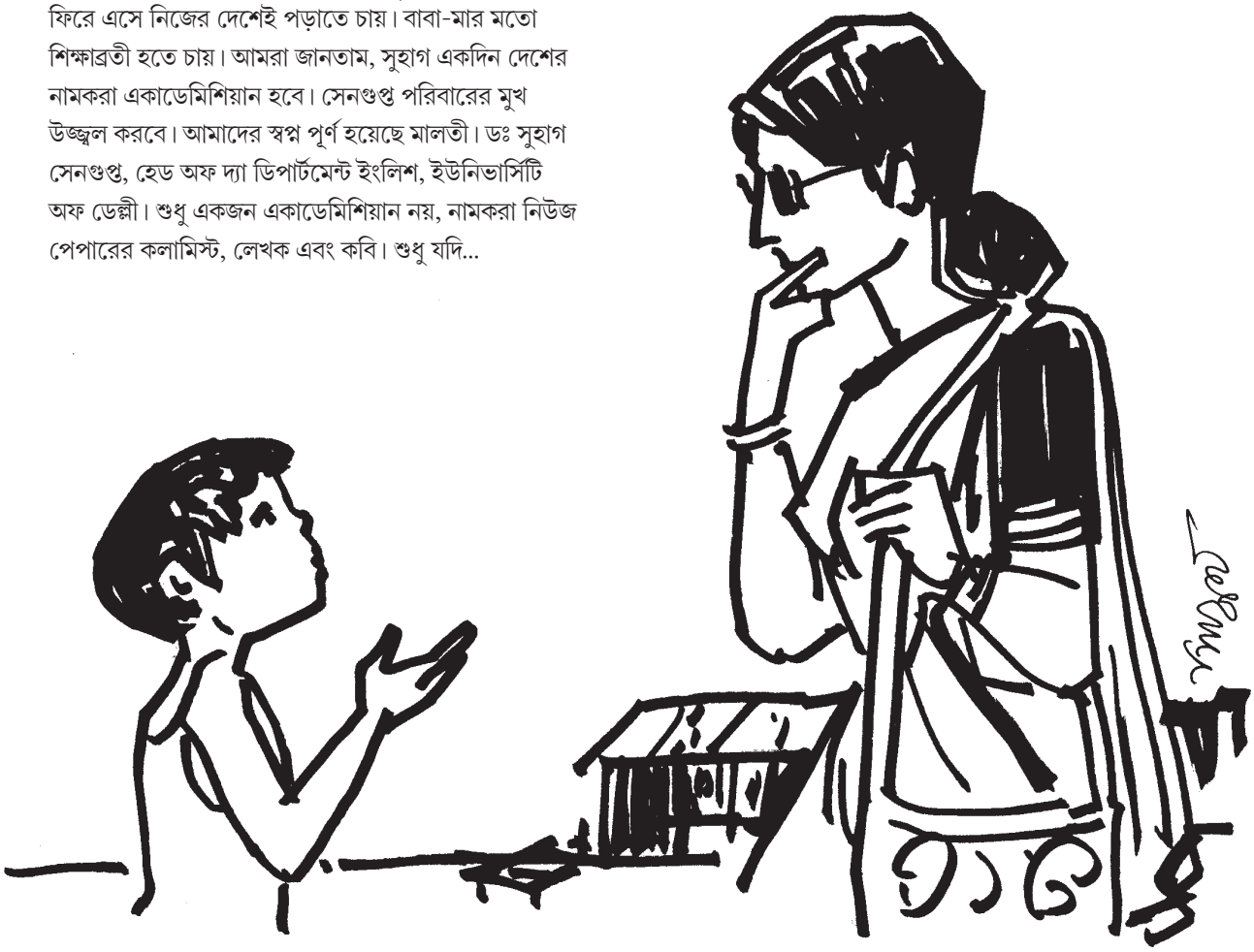

Laurel Securities Private Limited

(Member : The National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(Investment & Mutual Funds Advisor)

JAIN BAID & COMPANY

(Chartered Accountants)

312/313, Todi Chambers,
2, Lal Bazar Street, Kolkata-700 001
Phone Nos. 2230 0405, 2230 5846, Fax : (033) 2248 1576
E-mail : prakash_laurel@yahoo.com

With Best
Compliments:-

Anderson Wright International

With Best
Compliments:-

Monoj Kumar Kakra

Krishna Bangles
37, Biplabi Rashbehari Bose Road
2nd floor, Kolkata-1
M : 9831280306

একবার শালাকে ধরতে পারত তাহলে রামজী কসম পাঁঠা বলি দেবার খাঁড়াটা দিয়ে মুণ্ডুটা নামিয়ে দিত তেওয়ারি নিজের হাতে। যতদিন মা-টা ছিল তখন মর্ম বোঝেনি, কারণ পুঁটি দক্ষ হাতে তিনটে লোকের কাজ একা তুলে দিত। একে বয়স কম, তার উপর ঐ বয়সে মেয়েরা স্কুলে, কোচিং ক্লাশে যায়, খেলা করে, নাচটাচ শেখে বলে পরিশ্রান্ত হয়। পুঁটির ঐসব পাট তো ছিল না, তাই ও পুরো দমটাকেই ধাবার কাজে লাগাতে পারত। ও চলে যাবার পর থেকে ওর মর্ম হাড়েহাড়ে বুঝতে পেরেছে তেওয়ারি। দশদিনের মধ্যে বাসন মাজার একটা লোক জোগাড় হয়নি। তাপ্পিমেরে কাজ চলেছে। ওইটুকু বাচ্চা পিলের কাজ নাকি অতবড় ভাতের হাঁড়ি-কড়াই মাজা? হে রামজী আমাকে শ্রাপ দিও না। আমিও নিরুপায় বলেই পিলেকে দিয়ে কাজটা করাতে হয়েছিল। শুকনো এঁটো ভাত লেগে থাকত, তাতেই আবার ভাত রান্না হতো। আর পিলেও নিরুপায় তাই দুমুঠো ভাত-রুটি আর একটু চেনা আশ্রয়ের আশায় ডেকচির ভেতরে ঢুকে অসাধ্য সাধন করার চেষ্টা করেছে বেঁচে থাকার জন্য। দিদি ফিরে আসবে সেই প্রতীক্ষায়। আমিও শালা কম হারামী ছিলাম না। মেয়েছেলেগুলোকে ওরকম খোলা জায়গায় শুতে দেওয়া অন্যায় হয়েছে আমার। কমসে কম কেরাসিনের টিন কেটে একটা দরজা তো বানিয়ে দিতে পারতাম! ওদের খুন-পসিনা নিংড়ে নিয়ে কি এমন দিয়েছি আমি? একশো আদমীর খানা বানতো, তার থেকে কতটুকু আর ওরা খেতো? কুত্তা-বিল্লীরা ওদের চেয়ে বেশি খেয়ে নিত। পিলের মা টাকে জংলী জানোয়ারে কামড়ালো, চুহা হবে হয়ত। পুঁটি এসে কত কান্দল, কত গিরগিরালো একবার ডাক্তার দেখাবার জন্য। শালা মক্ষীচুষ আমার মন নরম হলো না। ইলাজ না হলে মরবে জানতাম, তবু জেনেশুনে পাপ করলাম। এখন দেখো, কেমন সাজা মিলেছে আমার! বুড়া হয়ে গেছি, লাখ্‌বা হয়ে বাঁয়া বাজু ঝুলে গেল, ল্যাংড়া হয়ে কোনোমতে চলাফেরা করি— সব রামজীর শ্রাপে হচ্ছে। রাকেশের বৌটা বুড্ডা শ্বশুরকে একটু সেবাও করে না। আমার তৈরি করা ধাবা এখন রাকেশের হাতে, ওর বৌ এখন মালকিন। ইজ্জত করবে কেন শ্বশুরকে? ও তো দেখেছে আমি কাজের লোকগুলোকে কত অত্যাচার করেছি! ওদের কাজের লোকরা বেশ সুখেই আছে। গালাগালি করে না রাকেশ, আধপেটা খেতে দেয় না, পুরা ভরপেট খানা পায় ওরা। সঙ্গে তেল, সাবুন, কাপড়াও দেয়। পূজার সময় বোনাস দেয়, ছুটি চাইলে ছুটি দিতেও কসুর করে না। আমি এতসব করতে বারণ করলে শোনে না রাকেশ। বলে— 'বাবুজী, জমানা বদলে গেছে। আগে আমাদের ধাবাটা একমাত্র ধাবা ছিল, এখন কম্পিটিশনের বাজার। কত ধাবা হয়ে গেল এখানে দেখলেন তো? যার ধাবা যত চমকদার, যার ধাবার নোকররা পরিষ্কার থাকে, খানার কোয়ালিটি বেহতর হয় লোকে তো সেখানেই বেশি যাবে। আগে তো শুধু ট্রাক আসত, এখন ডানকুনি ডেভলাপ হয়ে গাড়িবালা লোক এখানে খেতে আসে। দেখছেন তো বাবুজী, ধাবায় ডিনার করা এখন ফ্যাশন হয়ে গেছে। বড়লোকের সঙ্গে মেয়েবন্ধু নিয়ে ধাবায় পার্টি মানাতে আসে। এখন আমরা যদি কঞ্জুসি করে পিছিয়ে থাকি তাহলে তো গণেশ উল্টে যাবে।'

বুড়ো তেওয়ারি বুঝতে পারে, ছেলে ঠিক কথা বলছে। ও বিজনেস ভালই বোঝে। বি কম পাশ করেছে তো। যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে না চললে সত্যিই বিজনেস লাটে উঠে যাবে। আজকাল তাই তেওয়ারি আর নিজের নাক গলায় না। ও এখন বসে বসে সুর করে তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করে, চারপাশে কি হচ্ছে সব দেখে আর স্মৃতি রোমন্থন করে স্বকৃত পাপ খুঁজতে থাকে। এই খোঁজা খুঁজতে গেলেই পুঁটি, পিলে আর ওদের মা চোখের সামনে চলে আসে সবসময়। একদিকে রামজী প্রভুকে প্রার্থনা জানায়, আমাকে শ্রাপ দিও না। অন্যদিকে পাপগুলো কেন করতে বাধ্য হয়েছে তার স্বপক্ষে যুক্তি সাজায়।

পুঁটি তো চিরকালের জন্য কোনো অন্ধ গলিতে হারিয়ে গেছে এব্যাপারে ও নিশ্চিত। কিন্তু পিলে কেমন আছে, কোথায় আছে? এখন তো বড় হয়েছে। এখন নিশ্চয় তেলহীন রুক্ষ, কালো রং বদলে বাদামী হয়ে যাওয়া চুলে উকুন নেই ওর। পরিষ্কার শরীরে হয়ত পরিষ্কার পোশাক পরতে পায়। কি ময়লাই না ছিল ওর গায়ে। পুঁটি হারিয়ে যাবার পর ওর শরীরে রগড়ে স্নান করিয়ে দেবার তো কেউ ছিল না। তাই আমসত্ত্বর মতো পরতে পরতে ময়লা জমেছিল ওর গায়ে। খালি চুলকাতো নোখ দিয়ে।

ফুটোফাটা প্যান্টখানা পরে খালিগায়ে বিশাল বড় ডেকচিটার ভেতরে বসে ওটাকে মাজবার চেষ্টা করতে হতো ওকে। তখন এদিকটা এখনকার মতো উন্নত হয়নি। ধানক্ষেত, জলা জমিতেই ভরা ছিল। দূরে দূরে গ্রাম দেখা যেত। ধাবায় কাজের লোক পাওয়া খুব মুশকিল। পুঁটি চলে যাওয়ার পর একটা বাসন মাজার লোকের খোঁজে পরপর কয়েকদিন তেওয়ারি ভোরবেলা সাইকেল চালিয়ে রঘুনাথপুরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। বাজারে রাস্তার ওপর লাইন দিয়ে এসে বসতো দিনমজুররা। তাদের সঙ্গে থাকত কোদাল, কাটারি, দা, কুড়ুল আর একটা ঝুড়ি। ওরা বাগানের কাজ, নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে এমন জায়গায় জোগাড়ের কাজ, নারকেল গাছ পরিষ্কার কিংবা গাছ কাটার কাজ— এসবে পটিয়শ। ধাবায় বাসন মাজতে হবে শুনলেই মাথা নেড়ে বলত— 'ও কাজ হবে না গো বাবু। বাসন মাজার অব্যেশ নাই। ঝাঁট দিয়ে, ঝোপঝাড় কেটে পোষ্কার করতে বল, সে হয়ে যাবে। কিন্তু

বাসনমাজা হবে না আমাদের দিয়ে। অতটা পথ সাইকেল চালিয়ে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরতে হলো কয়েকদিন। আট বছরের পিলেই ভরসা। ডেকচির ভেতরে শুকনো কাঠ হয়ে লেগে থাকা ভাতের দানা মেজে সাফ করা সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে। সম্ভব ছিল না অত বড় বড় লোহার কড়াই, তাওয়া, এত এত থালা-বাটি-গ্লাশ কোনোটা মাজাই। তবুও কচি দুটো হাতে ও অবিরাম চেষ্টা করে চলত। এমন একটা বিকেলে পিলে যখন ডেকচির ভেতরে বসে ওর কর্মটি করার চেষ্টায় মগ্ন হয়ে রয়েছে, তখন একটা সাদা রংয়ের অ্যাম্বাসাডার গাড়ি দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে নামলো তিনজন ভদ্রলোক আর একজন মহিলা।

তেওয়ারি দৌড়ে গেল তাদের সাদরে আপ্যায়ন করে আনতে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা খুব শিক্ষিত মান্যগণ্য লোক। মন্ত্রীটন্ত্রী হবে না বোঝা যাচ্ছে। কারণ গাড়িতে লালবাতি লাগানো নেই। তবে বড় মাপের সরকারি অফসর তো হবেই বটে। — 'আসুন, আসুন, ইধার সে আইয়ে জী। খুশিতে তেওয়ারি প্রথমেই ভাষার খিচুড়ি বানিয়ে পরিবেশন করে ফেলে। গেস্টরা খুশিই হয়। ওরা এখন চা-টা খাবে আর রাতের খাবার সঙ্গে নিয়ে যাবে। অর্ডার দেওয়া হলো আলু পরোটা মাখন লাগিয়ে। কষা মাটন আর স্যালাড। ডেজার্ট হিসেবে ওরা গোলাপ জাম আর সন্দেশ চেয়েছিল, কিন্তু এদুটো পাওয়া যাবে না একথা সবিনয়ে জানালো তেওয়ারি। তার বদলে খাঁটি গাওয়া ঘি দিয়ে তৈরি গাজরের হালুয়া বানিয়ে দেবে, যা খেয়ে সাহেবদের বারবার এখানে আসতে হবে।

মহিলাটি উঠে ধাবার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল আর তখনই পড়ন্ত বিকেলে একটা বাচ্চা ছেলেকে বিশাল বড় একটা ডেকচির ভেতরে বসে ওটা মাজছে দেখতে পেল। এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত মহিলা ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করল— 'এই তুই এটা কি করছিস? এরকম করে কেউ খেলা করে নাকি? ওঠ।'

ভীতু দুটো কাজল কালো চোখে একবার মহিলাকে দেখে বাচ্চাটা মাথা নিচু করে আবার নিজের কাজে মন দিল। — 'এই ওঠ বলছি। এটা খেলা নয়, যা মাঠে গিয়ে খেলা কর। রান্নার বাসনের ভেতরে বসে নোংরা মাখামাখি করছিস? দাঁড়া আমি গিয়ে বলছি ধাবার মালিককে। তোর খেলা বের করবে এবার। ও মাগো! এটাতেই রান্না করবে হয়ত! খাবো কি করে?'

এবার ছেলেটা আরও ভয় পেয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে বলে— 'না, না। মালিককে বলো না তাহলে মারবে আমাকে। আগে আগে মা মাজত সব বাসন। মা মরে গেল। তখন দিদি মাজত। দিদি হারিয়ে গেছে।' — ছেলেটা ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল।

মহিলা বলল— 'ও, এবার বুঝেছি। দিদির পরে এখন তোর বাসন মাজার কাজ, তাই তো?'

দু'চোখ ভরা জল নিয়ে একথার উত্তর না দিয়ে ছেলেটা বলল— 'আমি তো ছোট। এটাকে নড়াতে পারি না, তাই ভেতরে বসে মাজি। তুমি মালিককে বলে দেবে না তো? আমি তো খেলা করছি না, কাজই করছি।'

মহিলার বুকের ভেতরে কষ্ট টনটন করে ওঠে। কত আর বয়স হবে ওর? হয়ত ছ-সাত বছর? এই বয়সে ওকেই আস্তো সেদ্ধ করা যাবে সেই মাপের পোড়া ডেকচি মাজতে হচ্ছে! মানুষ কত পাষণ্ড হলে এইটুকু বাচ্চাকে দিয়ে এমন কাজ করাতে পারে কে জানে। কি সুন্দর ওর চোখ দুটো, নাক-মুখ ধারালো, খ্যাঁদা-বোঁচা নির্বোধের মতো নয় মোটেই। এত নোংরা হয়েও ওর চেহারায় যেন ছাইচাপা আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে। — 'তোর আর কে কে আছে রে?'

ছেলেটাকেও কান্নায় পেয়েছে যেন। কাঁদতে কাঁদতেই বলে— 'আর কেউ নেই ওর। মা আর দিদি ছাড়া আর কেউ ছিল না কখনো। ও মালিকের কথা না শুনলে খেতে দেবে না ওকে। এখানে থাকতেও দেবে না। কোথায় যাব আমি? আমি যে ছোট, কিচ্ছু চিনি না। তুমি নালিশ করবে না তো?'

— 'না রে। নালিশ করব না। তবে তোকে এখানে এভাবে মরতেও দেব না। নিয়ে যাবো আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে। কোনো কাজ করতে হবে না তোকে, শুধু স্কুলে যাবি আর লেখাপড়া শিখে মানুষ হবি। এই আমাদের মতন হবি। আচ্ছা, তুই আগের মতো ছোবড়া ছাইমাটি দিয়ে বসে গামলাটা মাজ তো দেখি। আমি তোর ছবি তুলব।'

ছেলেটার মুখে এতক্ষণে খুশি ঝলকালো। — 'ফটোক তুলবে? আমার ফটোক? আমাকে দেবে তো?

— 'হ্যাঁ। এক্ষুনি দেব তোকে। জামাকাপড়, জুতো সব কিনে দেব। শুধু একটা শর্ত আছে। আমি যখন তোকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইব তখন তুই মালিককে বলবি, তুই আমার সঙ্গেই যেতে চাস। একেবারে ভয় পাবি না মালিককে। গোঁ ধরে বলবি— আমি ওদের সঙ্গে যাব। এক কাজ করবি, সোজা ঐ সাদা গাড়িটায় গিয়ে উঠে বসে পড়বি। বুঝেছিস তো? আমি তোকে এখানে পড়ে মরতে দেব না কিছুতেই। তোকে বাঁচতে হবে ভাল ভাবে। কি? পারবি তো মালিককে বলতে? আমরা এতজন আছি, তোর কোনো ভয় নেই। বিশ্বাস কর, ভয় নেই। দেখবি তোর মালিকই ভয় পেয়ে ছেড়ে দেবে তোকে।'

— 'ফটোকটা দেবে তো? সত্যি সত্যি দেবে?'

— 'বসে পড়। মাজ ওটাকে।' — মহিলা ক্যামেরার শাটার টিপতে আলোর ঝলকানিতে ছেলেটা চোখ বন্ধ করে

ফেলে। মহিলা ছবি বের করে ওকে দেখিয়ে বলে— 'দ্যাখ, চোখ বন্ধ করে ফেলেছিস। আর একটা তুলব, এবার চোখ বন্ধ করবি না কিন্তু?' — এরপর কয়েকটা শট নেয় মহিলা।

স্বর্গীয় সুষমায় মাখা মুখখানা ঝলমল করে ওঠে ওর নিজের ছবি দেখে। পরের ছবিতে আর চোখ বন্ধ করেনি। — 'ভিজে হাতে ধরবি না। এখানে ইঁট চাপা দিয়ে রাখছি। তুই এখন চাপাকলের নীচে এসে বস। স্নান কর। আমি কল টিপছি।'

— 'কিন্তু ডেকচিটা তো ধোওয়া হল না।'

— 'থাক ওটা। তুমি আর ওসব কাজ করবে না।'

শাড়ি কোমরে গুঁজে মহিলা চাপাকল টিপতে থাকেন।

— 'চান করে কি পরবি? আর জামাপ্যান্ট আছে?'

শুধু হাতে শরীর রগড়াতে রগড়াতে ছেলেটা বলে— 'আছে, আর একটা। ওগুলোও ছেঁড়া আর খুব নোংরা।'

— 'ঠিক আছে। আজই নতুন জামাপ্যান্ট হবে, তখন ওগুলো ফেলে দিবি। তোর নামটাই তো জিজ্ঞেস করিনি, কি নাম তোর?'

হি হি করে হেসে ছেলেটা বলে— 'আমার নাম পিলে গো! মা বলেছে ছোটবেলায় আমার পেট নাকি জালার মতো বড় ছিল, তাই মা পিলে বলে ডাকত।'

— 'বয়স কত জানিস?'

— 'হ্যাঁ, জানি তো। আট বছর।'

— 'তোর বাবা বেঁচে আছে?'

— 'জানি না। দিদি বলত আমাদের বাবা থাকে না। তুমি আমাকে দিদির মতন করে ভালবাসবে?'

— 'উঁহু। আমি তোকে মা আর দিদির থেকেও বেশি ভালবাসব, যদি রোজ স্কুলে যাস, পড়াশুনা করিস তবে।'

তেওয়ারি আজ এত বছর পরেও ভেবে ব্যাপারটার থই খুঁজে পায় না। মেহমান সাহেবদের বসিয়ে ও তাদের খাবারের তদারক করতে রসুই ঘরে চলে গিয়েছিল। ওরা পাঁচজনই মাঝবয়সী মানুষ। গোল হয়ে বসে ছিল বাইরের টেবিল ঘিরে। বিশ-পঁচিশ মিনিট পরে কুন্দন ছোকরা ওদের নাস্তা দিয়েছিল দুটো করে গরম সামোসা আর চা। রসুইঘর থেকে একবার বেরিয়ে এসে ও দেখেছিল কুন্দন তুলে রাখা দামী কাপ প্লেটেই সার্ভ করেছে নাস্তা। তখন চারজন ব্যাটাছেলে বসেছিল, মেয়েছেলেটাকে দেখতে পায়নি ও। এর একটু পরেই মেয়েছেলেটার গলা শুনতে পেয়েছিল, — রাগী গলায় আংরেজি আর বাংলা মিশিয়ে কি সব বলছে মর্দগুলোর কাছে। ও শুধু বাংলায় বলা এই কথাটুকুই বুঝেছিল যে ওরা সবাই ম্যাসাঞ্জোর বেড়াতে যাচ্ছে আর এখন মেয়েছেলেটা অন্য আর একজন কাউকে সঙ্গে নিতে চায়— এই নিয়েই তর্ক বেঁধেছে ওদের মধ্যে। দূর শালা, ওদের মামলা নিয়ে আমার কি? হেভী ডিনারের অর্ডার দিয়েছে রাত্রে কোথাও থেমে

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

A Well Wisher

K. M. AGARWAL

Kedia Fabrics

Kamal Kumar Kedia

Mfg. & Dealer of Fancy Sarees

160, Jamunalal Bazaz Street, 2nd Floor,
Kolkata-700 007

((s) 2272-5487

Mob : 9331105467

With Best Compliments

TANTIA
ISO 9001:2008

Tantia Constructions Ltd.

Major Civil Engineering Contractor for Road Works, Bridge & Flyovers, Housing Complexes, Industrial Structures, Railway Lines, Pile Foundation & Dykes.

Registered & Administrative Office

25-27, Netaji Subhas Road, 1st Floor,
Kolkata – 700 001
Phones : 033-2230-1896/6284 & 2230-7300,
Fax : 91-33-2230-7403
visit us at : www.tantiagroup.com

Corporate Office

DD-30, Salt Lake City, Sector-I
Kolkata - 700 064
Phone : +91 33 40190000, Fax : +91 33 40190001
e-mail : info@tantiagroup.com

Delhi office

708, 7th Floor, Ansal Bhawan
16, Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place
New Delhi - 110 001
Phone : +91 11 4578-5890/91/92
Fax : +91 11 4578-5894
E-mail : delhi@tantiagroup.com

A Well Wisher

Ram Gopal Chowdhary

খাবে বলে। এখন বাবুর্চিকে দিয়ে মেনুগুলো উম্‌দা করে বানাতে হবে। খাবারের স্বোয়াদ ভাল প্যাকিং এসব না হলে দ্বিতীয়বার আসবে না এখানে। ও তাই ভিতরেই ব্যস্ত হয়ে থাকল। বাইরে পিলেকে নিয়ে মেয়েছেলেটা যে এত কাণ্ড করে ফেলেছে তার বিন্দুবিসর্গ জানে না। সব ব্যবস্থা পাকা করে বাইরে এসে যা দেখল, তাতে তো ওর চক্ষুস্থির। হারামীর বাচ্চা পিলে ওদের সঙ্গে একটা চেয়ারে বসে আছে। স্নানটান করে পরিষ্কার হয়ে শালা ফাইভস্টার ক্যাডবেরি চুষছে।

— 'এ্যাই, এ্যাই পিল্লা হারাম খোর! তুই সাহেবদের সঙ্গে গিয়ে বসেছিস? তাও আবার কুর্শিতে? ক্যাডবেরিও চোরি করেছিস— এ্যাঁ! এত সাহস বেড়েছে তোর? এ্যাই কুন্দন! মরে গেছিস নাকি? দ্যাখ এসে এ শালা পিলে দুকান থেকে ক্যাডবেরি বার চোরি করে খাচ্ছে। দাঁড়া পিলে, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। সাহেব, আপনারা কিছু মনে করবেন না। ছোটলোকের ছানাপোনা এরকম অসভ্যই হয়। একটা চেলাকাঠের টুকরো তুলে নিয়ে পিলেকে মারতে আসতেই দৃশ্য পরিবর্তন হয়ে গেল। এর পরের ঘটনা আর মনে এলেও মনে করতে চায় না তেওয়ারি। খুব জোর বেঁচেছে পুলিশ কেস খাওয়া থেকে। ঐ মেয়েছেলেটা পিলের অতবড় ডেকচি কড়াই মাজার ফোটো তুলে নিয়েছিল ওর ক্যামেরাতে। ওরা সবাই সরকারি অফসরই ছিল। ঐ যারা ছোটছোট বাচ্চাদের দিয়ে একটা হাতির কাজ করায় তাদের ধরতে আসে হাতেনাতে। পিলেটার পায়ে ধরে মাফি চাইতে বাধ্য করেছে ঐ শালী! বাপরে, কি মাতাচণ্ডী রূপ শালীর। ব্রাহ্মণ হয়ে শেষকালে কিনা কুলশীল নেই পিলের পায়ে ধরে জান বাঁচাতে হলো আমাকে! পিলেটাকে গাড়িতে জামাই আদরে বসিয়ে নিয়ে চলে গেল ওরা।

স্বস্তিকার চুল বাঁধতে গিয়ে রোজই মালতী এক কথা বলে। — 'ইশ্‌ এখনও তোমার মাথায় কি চুল গো মাসীমা! আজও বলল। স্বস্তিকা বললেন— 'তোমাদের মতো হেয়ার থেরাপি, ডাই, এসব তো করিনি, তাই ওরা মায়া ত্যাগ করে ঝরে যেতে চায় না বোধহয়। মায়া ত্যাগ করে তো প্রিয়জনরাই আমাকে একা করে দিল, যাদের আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল তারা তো বুঝল না আমি তাদের জন্য কত রং-বেরংয়ের কালার ডাই জমিয়ে রেখেছিলাম মনের মধ্যে শুধু তাদের জীবনের পট আঁকব বলে। ঠেক খেয়ে বুঝেছি বেশি যত্ন, বেশি ভালবাসা দিলেই বিপদ। ঘোরতর সন্দেহ আর সংশয়ে মাথার চুলের মতোই ঝরে যাবে সম্পর্ক। আমি সারাজীবন রোজ মাথায় নারকেল তেল মেখেছি। বিনা যত্নেও এত চুল দিব্যি তালু কামড়ে ধরে আছে এখনও।'

ঝুল বারান্দায় পথের দিকে মুখ করে চেয়ারে বসেছেন স্বস্তিকা, পেছনে দাঁড়িয়ে মালতী চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। মাসিমার কথা শুনে বলল— 'মনে হচ্ছে আজ কাহিনীর আর এক অধ্যায় শুরু হবে। তোমার কথার মধ্যে সেরকম ইঙ্গিতই পেলাম যেন। বলতে আরম্ভ করে দাও। যত বলবে ততই বোঝা ঝরবে। আবর্জনা জমিয়ে রাখলেই স্বাস্থ্যহানি হয়।'

— 'তুমি কি আমাকে লুকিয়ে লেখটেখ নাকি মালতী? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি একজন নার্স শুধু নও, একজন মনোবিদও লুকিয়ে আছে তোমার ভেতর। তা না হলে কি করে বোঝ আমি কিছু বলতে চাই?'

— 'লিখিও না, মনোবিদও নই। তোমার সঙ্গে এতদিন ধরে কাছাকাছি আছি, এখনও তোমাকে চিনব না?'

— 'তাহলে আমার আত্মজ সুহাগ কেন চিনল না?'

— 'আমি যদি বলি সুহাগ তোমাকে চেনে কিন্তু পরিস্থিতির চাপে ওকে বাধ্য হয়ে না চেনার ভান করতে হয়, যদি বলি ও সবচেয়ে অসহায়, তাহলে মানবে?'

— 'আমি তো জানি ও স্যাড্ডইচ হয়ে যাচ্ছিল। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল ওর। ও তো সবচেয়ে বেশি অসহায়ই। আমি আর সপ্তর্ষি যেমন সুহাগের জীবনের দিকে তাকিয়ে নীরবে সব সহ্য করেছি, তেমনি সুহাগও নিজের একমাত্র মেয়েটার মুখ চেয়ে নীরবে বৌয়ের ডিক্টেটারশিপ সহ্য করে যাচ্ছে। শান্ত, অত্যন্ত মার্জিত ছেলেটা সংসারের কোনো মারপ্যাঁচ চোখে দেখেনি তো আগে। পড়াশুনোর মধ্যেই ডুবে থাকত। বেশি বন্ধুবান্ধবও ছিল না ওর, তাই আড্ডা মারার মোহ গড়ে ওঠেনি কখনো। বই-ই ওর বন্ধু আর ধৃতিমান কাকু বিশেষ বন্ধু। জানো মালতী, ওর বিয়েটা আমার ইচ্ছেতে হয়েছিল। আমিও পাত্রী পছন্দ করেছি। অক্সফোর্ডে থাকার সময়ই দিল্লি ইউনিভার্সিটি ওর ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে যোগাযোগ করেছিল দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করার জন্য। ও তো দেশে ফিরে এসে এদেশেই পড়াবার সঙ্কল্প নিয়েই রেখেছিল, তাই আমন্ত্রণ পেয়ে বাবাকে জানালো যে ও দিল্লিতেই জয়েন করবে। সপ্তর্ষি খুশি মনে মেনে নিয়েছিল। আমিও খুশি ছিলাম এই ভেবে যে, যাক, বিদেশের মোহ ছেলেটাকে স্পর্শ করতে পারেনি সত্যিই। ছেলে আমাদের কাছেই থাকবে। সপ্তর্ষিকে বলেছিলাম— হ্যাঁ, গো, ডিগ্রির মালা পরতে পরতে যে মেঘে মেঘে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। এবার ওর বিয়ের কথা ভাবতে হবে তো?

সপ্তর্ষি বলল— 'তুমি কি জানো যে ও নিজে কাউকে

পছন্দ করে রেখেছে কিনা! আগে আসুক ফিরে তারপর ওর মতামত জেনেই এগোনো যাবে।'

বললাম— 'বেশ তাই হবে।' — মনে মনে স্বপ্নের জাল বুনি। তিনজনের ছোট পরিবারে চতুর্থজন আসবে। তারা আবার পঞ্চম, ষষ্ঠ, অন্তত দুজন সদস্যকে আনবে পৃথিবীতে। আমার সংসার, এতবড় বাড়ি ভরে থাকবে ছ'জনের পায়ের আওয়াজে, শিশুদের হাসি ভোরের দোয়েলের গানের মতো স্নিগ্ধ শান্তির স্পর্শ বোলাবে প্রাণে।

ফিরে এসে মাত্র সাতদিন ছিল বাড়িতে। তখনই আমরা দু'জনে মিলেই ওকে জানালাম— 'অনেক সম্মানের মালা পরেছ গলায়। এবার বিয়ের মালা পরতে হবে সুহাগ। তুমি কি নিজে কাউকে পছন্দ করে রেখেছ?'

— 'ওরে বাবা! নিজের পছন্দ-টছন্দ করার সময় নেই আমার। বিয়ে করব এবার এ সিদ্ধান্তটা অবশ্য নিয়েছি। তবে মেয়ে পছন্দ করাটা তোমাদের ব্যাপারে কিন্তু। আমি ওর মধ্যে নেই।'

সপ্তর্ষি বলল— 'বেশ, আমরা না হয় পাত্রী খুঁজতে বেরোবো। কিন্তু তোর ব্যক্তিগত ইচ্ছে তো একটা আছে। বল্ কেমন মেয়ে চাস তুই স্ত্রী হিসেবে?'

মুচকি হেসে সুহাগ বলল— 'আমার মায়ের মতো। পারবে বাবা মা-র একটা ডুপ্লিকেট এনে দিতে?'— মালতী, সেদিন আনন্দে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। সপ্তর্ষি ছেলের কান মুলে ধরে নকল গোঁসা দেখিয়ে বলেছিল— 'ওরে আমার মাতৃভক্ত পেল্লাদ রে! বাবার নামও উচ্চারণ করল না দেখ্।'

— 'ওরে বাবা! তাহলে তো মোটা গোঁফ ইয়া দাড়ি থাকবে, সে মেয়ে চলবে না। দেখ, শিক্ষিত হতে হবে, আমাকে বুঝতে পারবে এমন হতে হবে, ঝগড়া টগড়া করবে না। ব্যাস, তোমাদের ভালবেসে মিলেমিশে থাকতে পারলেই বর্তে যাব। জাত-পাত, ফর্সা-শ্যাওলা ওসব দেখার দরকার নেই। শান্ত মার্জিত, রুচিবোধ আছে এমন হলেই হবে। এবার আমি উঠি। তোমরা খোঁজো।' — বিয়ে হলো সুহাগের প্রচুর আড়ম্বর করে। — এতটুকু বলে স্বস্তিকা একেবারে গুম মেরে যান। মালতীও ঘাঁটাবার সাহস পায় না। গণ্ডগোলের সূত্রপাত যে এই বিয়ে থেকেই হয়েছে সেটা আন্দাজ করতে পারে ও। চুলবাঁধা হয়ে গিয়েছিল। কমলা মাসি ট্রেতে দু'কাপ চা আর মুড়িমাখা রেখে গেল। মালতী চায়ের প্লেটটা তুলে স্বস্তিকার সামনে ধরে বলল— 'ধর, চা জুড়িয়ে যাবে।' স্বস্তিকা নিলেন এবং এক চুমুক খেলেনও। সূর্য ঢলে গেছে একটু আগে। ঝিরঝিরে হাওয়া ঝুলবারান্দা ছুঁয়ে যাচ্ছে। কোনাকুনি পার্কটাতে বৃদ্ধদের বেঞ্চ দখল করে আসরও বসে গেছে। স্বস্তিকা এসব দেখছিলেন। পুরো চা-টুকু নীরবে পান করলেন, মুড়ির বাটি ছুঁলেনও না। কাপপ্লেট নামিয়ে রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন— 'সুহাগের জীবনে অশান্তির কারণ আমি। এ মেয়ে সপ্তর্ষির পছন্দ ছিল না। বলেছিল— যত সুন্দরী আর শিক্ষিতাই হোক, আমার কিন্তু ভাল লাগেনি স্বস্তি। বাবা ফরেন সার্ভিসে আছে, মেয়ের বাবা ডিভোর্সি, মেয়ে বিদেশে বিদেশে বড় হয়েছে, সেকি আমাদের মতো সিম্পল মানুষদের বশে থাকবে? যার বাপ-মার মধ্যে মনের মিল হয়নি বলে ডিভোর্স হলো সেই মেয়ে তো বিয়ের বন্ধনের মূল্যই দিতে শিখল না। আমার ওকে অহঙ্কারী, দাম্ভিক, ডমিনেটিং বলে মনে হয়েছে। একে বৌমা বলে তো ভাবতেই পারছি না আমি।'

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিলাম— 'তবে কি একমাথা সিঁদুর, পায়ে আলতা, মাথায় ঘোমটাটানা, সকাল বেলায় চায়ের পেয়ালা হাতে বিছানার পাশে এসে বলবে — বাবা চা নিন, এমন একটা বৌমা বৌমা মেয়ে চাও তুমি? সবদিক মিলিয়ে পাওয়া যায় না সপ্তর্ষি। তোমার ছেলের স্ট্যাটাসের কথাটাও মাথায় রাখতে হবে। রূপ-গুণ, উচ্চশিক্ষা, বলে বেড়াবার মতো বাপের পরিচয় যার সে একটু নাকউঁচু হতেই পারে। সুহাগের খুব একটা অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না আমার। অসুবিধা হয়ত আমাদের হতে পারে, কারণ আমরা তো এখনও উনিশ শতকে বাস করছি। একশো বছর পিছিয়ে রয়েছি। তা, একটু মানিয়ে চললেই হবে। ছেলেটার মান-মর্যাদা থাকুক, ওর সমাজে ওর বৌ প্রেজেন্টবল হোক, এর বেশি আমি তো কিছু চাই না। আমাকে গোটা দু-তিন নাতি-নাতনি উপহার দিলেই আমি দাসানুদাস হয়ে থাকতে পারব। তুমিও তখন দাদু হয়ে আহ্লাদে গদগদ হয়ে যাবে, দেখো।'

— 'আমি বেশি আশা করছি না স্বস্তি। সরি।'

বিয়ের পর মাত্র পনের দিন ছিল ওরা। বাংলা ভাল বলতে পারত না। ওর বাবাকে আমাদের খুব ভাল লেগেছিল। অমায়িক মানুষ। আগেই বলেছিলেন,— আমার মেয়ে বাংলা বোঝে, বলতেও পারে, কারণ ওর মা আর আমি বাড়িতে বাংলায় কথা বলতাম। তবে মেয়ে কিন্তু খুব ভাল বলতে পারে না। দেখুন, আমি কখনো সাউথ আফ্রিকান কান্ট্রি, কখনও স্ক্যান্ডেনেভিয়ান কান্ট্রি, মিডল-ইস্ট, ইউ কে, ইউ এস এ— কোথায় যে না থাকি বলতে পারব না। মেয়েটাকে বাংলা কৃষ্টি সংস্কৃতিও শেখাতে পারিনি। নিজের মেয়ে মনে করে আপনারাই ওকে নিজেদের মতো তৈরি করে নেবেন। এত চমৎকার একটা ছেলে তৈরি করেছেন, আর আমার মেয়েকে বৌ করে এনে শেখাতে পারবেন না এ কি হয়?'

পারিনি। রেসের ঘোড়াকে কি যুদ্ধের ঘোড়া বানানো যায়? প্রথম পনের দিন বেশ ভালই কাটিয়ে দিল্লিতে গেছে। তবে আমার বা সপ্তর্ষির সঙ্গে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা করতে

চায়নি। বেশ ডিসট্যান্স মেনে চলত। আমাদেরও খারাপ লাগেনি। ছ'মাসের মধ্যেই প্রেগন্যান্ট হলো। একা ঘরে প্রথম প্রসূতি কি করে থাকবে ভেবে আমি গেলাম প্রথম তিনটে ভাইটাল মাস সঙ্গে থাকব বলে। তখন বুঝলাম আমার আসা ওর পছন্দ হয়নি। বেশি ডিটেইলস্‌য়ে যাচ্ছি না মালতী। সংক্ষেপেই বলি— নিজের জীবনের দুর্ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য ওর উপেক্ষাকে আমল না দিয়ে সেবা, যত্ন তদারক করতাম। ও কেমন যেন বিরক্ত হয়ে যেত। এসবের প্রয়োজন নেই, ও একাই সব সামলাতে পারে, এখন সবকিছু রেডিমেড ইন্সটেন্ট পাওয়া যায়, এটা টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির শেষ ভাগ, সম্পূর্ণ বদলে যাওয়া দুনিয়া— এসব শোনাত আমাকে যখন সুহাগ থাকত না। একদিন বলেই ফেলল— আমি আমার নিজের মতো থাকতে ভালবাসি। থার্ড পারসনের প্রেজেন্স যেমন ভাল লাগে তেমনি, সেঞ্চুরি ওল্ড আইডিয়াস আমার ওপর কেউ যদি ইমপোজ করতে চায় তাহলে আরও বেশি খারাপ লাগে। ফার্স্ট প্রেগন্যান্সির গুরুত্ব বোঝার বয়স আমার হয়েছে। আমি কিন্তু আপনাকে ডেকে আনিনি আমার দেখাশুনা করার জন্য। জানিনা আপনার ছেলে ডেকেছে কিংবা আপনি নিজেই উপযাচক হয়ে এসেছেন। ইন্ডিয়ান মাদার-ইন-লজ-রা এরকম হয় বইতে পড়েছি। ফার্স্ট প্রেগন্যান্সি হাসব্যান্ড-ওয়াইফের মধ্যে একটা বিশেষ রোমান্টিক, বিশেষ পারসোনাল সম্পর্কের কয়েকটা মাস। এই সময় শুধু দুজনে থাকলে ভাল লাগে। দুজনের মাঝখানে ট্রেসপাস করে অন্য কেউ ঢুকে পড়লে খারাপ লাগবেই। আমি কি বলতে চাইছি বুঝেছেন?'

খুব ভালই বুঝেছিলাম। সপ্তর্ষিই ঠিক চিনেছিল। আমি ভুল করেছি সপ্তর্ষির কথা 'ইগো'র চাপে উড়িয়ে দিয়ে। আজ তারই সাজা হাতেনাতে পেলাম। ভবিষ্যতে আরও পাবো অবধারিত ভাবে। সেইরাতেই খাবার টেবিলে সুহাগকে বললাম হাসিমুখে— 'হ্যাঁরে, রুরু তো ভালই আছে বেশ। নিজের কেয়ার নিজে নিতেও পারে দেখছি। তাহলে অকারণ ছুটি নষ্ট করে এখানে থাকার দরকার কি আমার? পরে যদি প্রয়োজন হয় তখনকার জন্য ছুটিটা বরং জমা থাকুক। তুই কাল-পরশুর রিজার্ভেশন বা ফ্লাইটের টিকিট করে দে। ওখানে তোর বাবাও একা তো!'

সুহাগ আশ্চর্য হয়ে বলে — 'সে কি মা!' এই যে বললে প্রথম তিনমাস মোস্ট ভাইট্যাল পিরিয়ড? আমার আগের দু'ভাই ঐ সময়ে এবর্ট হয়ে গিয়েছিল?'

— 'হ্যাঁ। কিন্তু রুরু তো আর আমার মতো ভিড়ের বাসে চেপে পড়াতে যাচ্ছে না। ও ঘরেই থাকে, সাবধানে থাকতে জানেও দেখছি। ও যথেষ্ট সচেতন। শুধুশুধু থাকার কোনো মানে নেই।'— ছেলেটার মনে কষ্ট দিয়ে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে এসেছিলাম।

যথাসময়ে ভালভাবেই মেয়ে হয়েছিল ওদের দিল্লিতেই। সুহাগ ফোনে জানাল বেবী নার্স রেখে দিয়েছে দু'বেলা দুজন। সপ্তর্ষিকে সবই বলেছিলাম, ক্ষমাও চেয়েছি

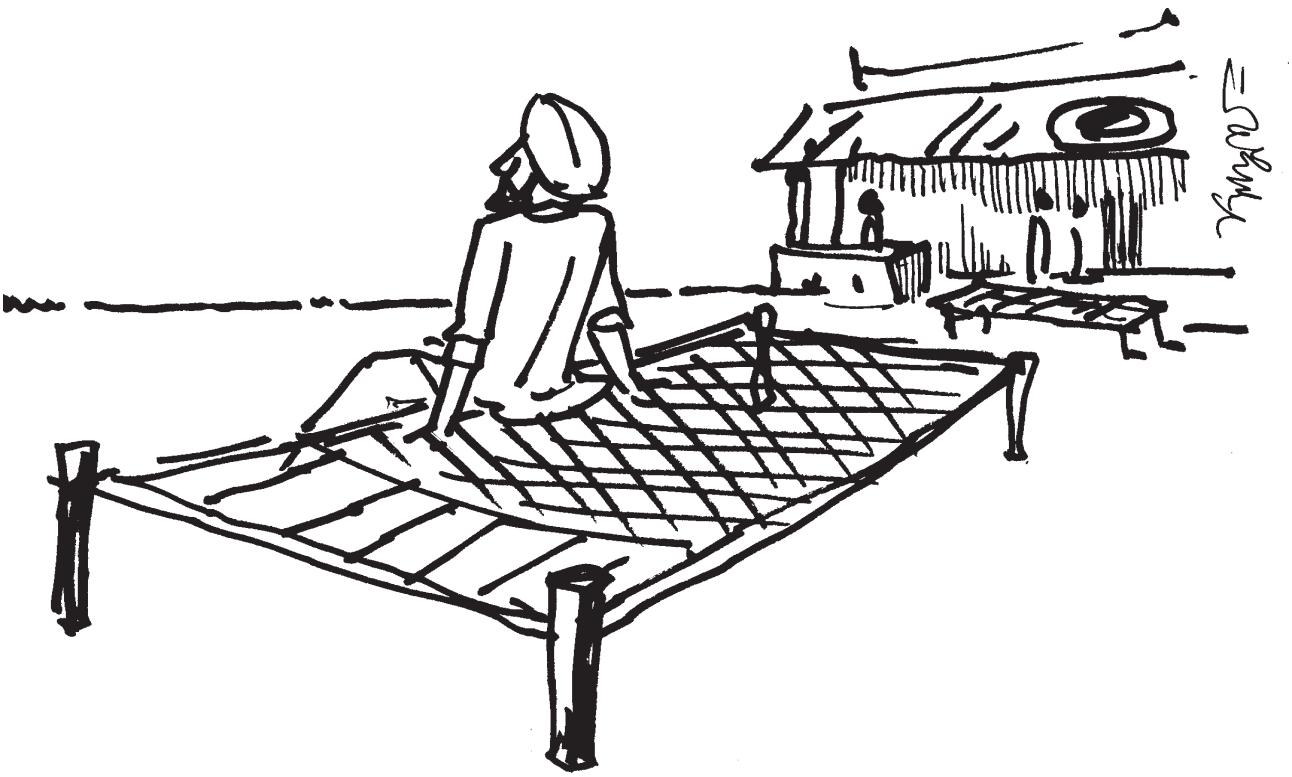

নিজের দোষ স্বীকার করে। ও একটুও দোষ দিল না আমাকে। বলল— 'নিয়তির লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না স্বস্তি। এটাই হবার ছিল তাই হলো। তুমি শুধু উপলক্ষ মাত্র। নাতি-পুতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার স্বপ্ন আর দেখ না। নিজেকে শক্ত কর।'

লোকলজ্জার থেকে বাঁচার জন্য নাতনির অন্নপ্রাশন এখানেই করাতে হলো। আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বলে ছেলে চারজনের প্লেনের টিকিট কেটে এনেছিল। নানা অজুহাত দেখালাম আমরা। সুহাগ কিছু অনুমান করতে পেরেছিল হয়ত। বলল— 'এত কাছে থেকে যদি নিজের বাবা-মার জন্য কিছুই না করতে পারি তাহলে এদেশে থেকে শিক্ষকতা করার সার্থকতা কোথায়? আমার ছাত্ররাও ডিগ্রি জমা করবে পকেটে কিন্তু মানুষ হবে কি? তোমরা তো আমাকে মানুষের মতো মানুষই করেছিলে, কি কাজে লাগল আমার মানুষ হওয়া? মা, বলত, সত্যিই কি আমাদের মধ্যে সম্পর্কের বাঁধন টিকে আছে? রুরুকে আমি চিনে ফেলেছি মা। ওর ল্যাজ কখনোই সোজা হবে না, বাঁকাই থাকবে। বাবা আর তুমি আমাকে কিছু বল না বলে কি আমি এত বোকা যে কিছু বুঝতে পারি না? তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যখন থাকতে পারব না তখন দুটো অপশন আছে আমার। প্রথম অপশন মান বাঁচানোর জন্য দূর বিদেশে থাকা আর সেকেন্ড অপশন ডিভোর্স করা। আমার মেয়েটার আশা তাহলে ত্যাগ করতে হবে। ও রুরুর কাস্টডি পাবে। তাই প্রথম অপশনটাই নিতে হবে আমাকে। এভাবে চলে না মা! রুরু তোমাদের চায় না একথা ভাবতে ভাবতে আমার প্রেসার এখন হাই থেকে আর নর্মালে আসে না।'

বছর দু-তিন সুহাগ যখনই পারত একাই আসত এখানে। নাতনিটাকেও আসতে দিত না রুরু। সুহাগ মেয়ের অনেক ছবি তুলে নিয়ে আসত। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতাম আমরা। তারপর ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে চলে গেল। দেশত্যাগী হয়ে যেতে বাধ্য হলো ছেলেটা। সপ্তর্ষি রাগে-দুঃখে পণ করে বসল একটা কুলশীলহীন অনাথ শিশুকে মানুষ করবে বলে। আমি এবার আর 'ইগো'র বশবর্তী হলাম না। সানন্দে মত দিলাম। শুরু হলো খোঁজা। ওর বন্ধুরাও খোঁজার কাজে যোগ দিল সরকারি-বেসরকারি অরফ্যানেজগুলোতে। পছন্দমত পাওয়াও গেল, কিন্তু বাদ সাধলো বয়স— মানে আমাদের বয়স। লিগ্যালি আমাদের বয়সের মানুষকে বাচ্চা এ্যাডপ্ট করার রাইট দেওয়া হয় না। সপ্তর্ষি এবং ধৃতিমান, অয়ন, শুভদীপরা বলল— 'দূর। লিগ্যালি না হলে এমন একটা মহৎ উদ্দেশ্য বেআইনি ভাবেই সফল করব দাঁড়া না। ফুটপাথে, তুফান-ভূমিকম্প, ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট— এসব জায়গা থেকে ধরে আনব তোদের নাতি।'

সপ্তর্ষি ছেলেকে বলেছিল ফোনে ওর ইচ্ছের কথা— 'আমি একটা সঙ্কল্প নিয়েছি রে। তোর মা আর আমার মনের সাধগুলোকে পূর্ণ করার বড় ইচ্ছে জেগেছে। এখনও শরীর স্বাস্থ্য ভাল আছে। কুড়ি বাইশ বছর বাঁচব আশাকরি। তোর মেয়ের বয়স বারো বছর হয়ে গেল। আর সন্তান হবে বলে মনে হয় না। রুরু নাকি তোর মাকে বলেওছিল আমরা যেন ওর কাছ থেকে একটা নাতির আশায় না থাকি। সেনগুপ্তদের বংশ রক্ষা করার দায় ওর নয়। সে যাকগে। ও তো কত কথাই বলেছে স্বস্তিকে। শোন, আমরা একটা অনাথ শিশু অ্যাডপ্ট করব মনস্থ করেছি। কিন্তু এই বয়সে আমরা লিগ্যালি অ্যাডপ্ট করার যোগ্য নই। তুই...

বাবাকে থামিয়ে দিয়ে ছেলে বলল— 'লিগ্যাল ম্যাটারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও বাবা। ওটা আমি করে দেব। তোমরা জোগাড় করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানিও। আমি এসে এফিডেবিট করে নেব আমার ছেলে বলে। ব্রাভো বাবা! এই তো আমার বাবা-মার মতো মানুষের কথা। রুখে দাঁড়াও তোমরা রুরুর বিরুদ্ধে। সুস্থ থাক, যাতে যাকে নিয়ে আসবে তাকে বড় করে রেখে দিয়ে যেতে পার। আমি আছি পিতৃ-পরিচয় দেবার জন্য, কোনো ভয় নেই। এগিয়ে যাও তোমরা।' — ঠিক সময় এসে এফিডেবিট করে দত্তক নিল পিলেকে। ওর মেয়ের নাম তপস্যা। নাম মিলিয়ে পিলের নাম রাখল তর্পণ। পিলের গল্প তুমি জান মালতী। ওর গল্প নতুন করে বলার আর দরকার নেই। তুমি তো দু'বছর ধরে ওকে দেখছ। সুহাগের ঔরসে জন্ম না হয়েও ঐ পিলে- মানে তর্পণ লেখাপড়ায়, আচারে-আচরণে একেবারে সুহাগের মতই হয়েছে। সপ্তর্ষির মৃত্যুর পর সুহাগ বলেছিল আমাকে— 'মা, আমার আসার অপেক্ষায় বাবাকে কেন মর্গে রাখতে বলছে সবাই? আমার ছেলে তো রয়েছে ওখানে। ও দাদুর মুখাগ্নি করবে। বাবা ঠাণ্ডা ঘরে... কেঁদে ফেলেছিল ছেলে। ওর কথা অবশ্য পরিবারের অন্যরা শোনেনি। ও আসার পরই তাই করা হয়েছিল সপ্তর্ষিকে। তর্পণকে সঙ্গে নিয়ে নিয়ম পালন করেছিল, শ্রাদ্ধের কার্ড বিলি করেছিল, শ্রাদ্ধ করেছিল পুত্র সুহাগ সেনগুপ্ত আর নাতি তর্পণ সেনগুপ্ত মিলে। আমার জীবনের প্রিয় নক্ষত্ররা আমাকে একা রেখে দূরে দূরে সরে গেল। নাতনিকে আমরা চিনতে পারলাম না, সেও আমাদের চিনল না। নাতিটাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে যেতে পারলেই হয়। সেই কাজটুকু সম্পূর্ণ করার জন্যই সপ্তর্ষি আমাকে রেখে গেছে দায়িত্ব দিয়ে। আর মেধাবী ছেলের গর্বে গর্বিত সুহাগ ভরসা করেছে মায়ের ওপর। তর্পণ পাশ করে বেরোলে সেও চলে যাবে আমেরিকা। সুহাগ সব ব্যবস্থা করেছে। আমিই একা থাকব।'— মালতী বলল— 'তর্পণ কোথাও যাবে না মাসিমা তুমি বেঁচে থাকতে। দেখে নিও তুমি।'

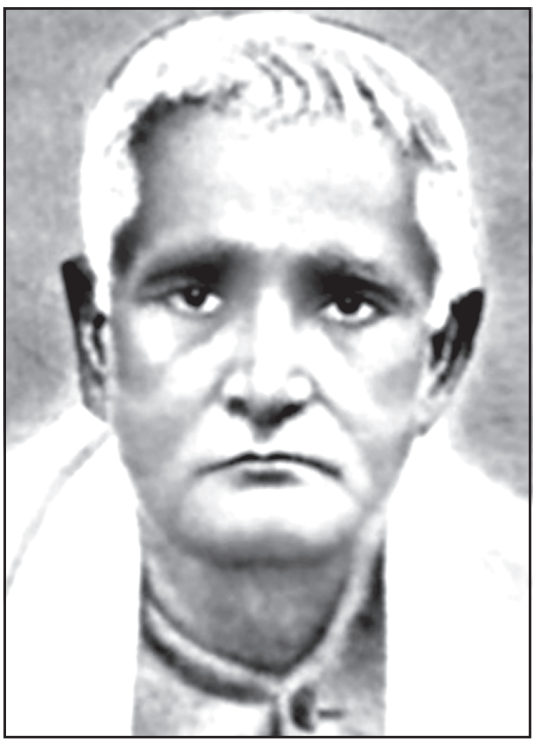

সার্ধশতবর্ষে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর

ঐতিহ্য, আধুনিকতা, বিজ্ঞান-সাধনা ও স্বদেশ চেতনা

প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

আজ থেকে দেড়শত বছর আগে দু'জন মনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল— দু'জনেই বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা চিন্তা করেছিলেন। আবার দু'জনেই ছিলেন স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এক বছরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য পার্থক্যও ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর গ্রাম বাংলার সন্তান। শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনে কলকাতা ছিল তাঁর ভিত্তিভূমি। অন্যদিকে স্যার আশুতোষ ছিলেন কলকাতার সন্তান। শহর কলকাতার শিক্ষিত উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। পেশার দিক থেকে রামেন্দ্রসুন্দর শিক্ষাবিদ ছিলেন, স্যার আশুতোষ ছিলেন আইনজীবী ও বিচারপতি। স্যার আশুতোষের কালজয়ী অবদান হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার ভিত্তি গড়ে তোলা।

দু'জনের মধ্যেই স্বদেশচেতনার অভিব্যক্তি ঘটেছিল। রামেন্দ্রসুন্দর জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে নিজেকে বিযুক্ত করেননি। কিন্তু স্যার আশুতোষ গোলদীঘির গোলাম খানাকে স্বাধিকার ও মুক্ত চিন্তার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তাঁর কাছে স্বাধীনতা প্রথম, স্বাধীনতা দ্বিতীয় এবং স্বাধীনতাই শেষ কথা। তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস করেননি। হাত মেলাননি। তাঁর নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রধানতম প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে পরিণত হয়। বাঙালি মনীষার বিকাশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রধান অনুঘটক।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন একজন কৃতীছাত্র ও সফল অধ্যাপক। কান্দী স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথন হন। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নের অধ্যাপক পেডলার রসায়ন শাস্ত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যুৎপত্তি দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

কর্মজীবনে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন সফল শিক্ষাবিদ। ১৮৯২ সালে রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন এবং ১৯০৩ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত টানা ষোল বছর রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রিপন কলেজ পরিচালনায় তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক সহযোগিতা লাভ করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন পেশায় শিক্ষাবিদ, কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় হল তিনি ছিলেন লেখক চিন্তাবিদ। বিখ্যাত লেখক ও

Autoply Harness Industries

Commerce House (1st Floor, Room No. 3-A)

Manufacturers of

Autoply® BRAND

Automobile Wiring Harness,
PVC Auto Cable, Battery Cable, PVC Tape,
Wiring Terminal
and Auto parts

2, Ganesh Chandra Avenue
Kolkata - 700 013

Phone : 2213-2971, 2213-2907

Durga Puja Festival Greetings
to
All Our Customers, Patrons
and Well Wishers.

MAZZA DENIM

Incense Sticks

Now you can capture the beauty of an experience light-up and unfold a thousand petals.

Shashi Industries

Bhabnagar - 364 001
Bangalore - 560 010

DURGA TRADING CO.

40, Strand Road, Fourth Floor, Room No.4,

Kolkata - 700 001

Phone : 2243 1722 / 1447, Fax No. 033 2243 3922

E-mail : aksadt_saboo@yahoo.co.in

Leading Raw Meterial Supplier to Paper Mills :

Bamboo, Hardwood, Bamboo Chips and other Raw Materials for Paper Mills.

Pan No. AACHA0716 M

সাংবাদিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকায় (১৩২৬ আশ্বিন) রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে রামেন্দ্রসুন্দরের মনীষার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে 'নীলকণ্ঠ' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায়, ''আমার মনে হয় রামেন্দ্রসুন্দর ডিরোজিও-যুগের প্রতিক্রিয়ার অবতার। প্রতীচ্য শিক্ষা তাঁহাকে প্রাচ্য ভাবে, প্রাচ্য সংযমে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন রামেন্দ্রসুন্দর, প্রতীচ্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সিদ্ধ সাধক রামেন্দ্রসুন্দর 'অবহেলে বিলাতী' হইবার প্রলোভন সংবরণ করিয়া সে কালের বাঙ্গালার সাবেক চণ্ডীমণ্ডপের খাঁটি বাঙ্গালী থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। যে শিক্ষায় বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী রূপান্তরিত হইয়া অদ্ভুত ও উদ্ভটের উদাহরণ হইতেছে, তিনি সেই শিক্ষা আকণ্ঠ পান করিয়াও অভিভূত হন নাই। তিনি নীলকণ্ঠের মত বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মন্থন-সম্ভূত হলাহল স্বয়ং জীর্ণ করিয়া, তাহার অমৃতটুকু দেশবাসীকে দান করিয়া গিয়াছেন। বাল্যজীবনের পারিবারিক দীক্ষা তাঁহাকে রক্ষাকবচের মত রক্ষা করিয়াছিল।"

রামেন্দ্রসুন্দরের চোখে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র

রামেন্দ্রসুন্দর কথায় কাজে ছিলেন স্বদেশ চেতনার প্রতিমূর্তি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল ছিল। দু'জনেই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করেছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি অনবদ্য ভাষায় এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন—

''বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য, বাংলার পুরাতত্ত্ব, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার পুরাবস্তু, বাঙ্গালার অবদান— এককথায় বাঙ্গালীর প্রাণ তাঁহার ধ্যানের বস্তু ছিল। জাতীয়তার এমন একনিষ্ঠ, আত্মমগ্ন, প্রচ্ছন্ন উপাসক আমি জীবনে অতি অল্প দেখিয়াছি। 'যেমন গঙ্গা পুজো গঙ্গা জলে', রামেন্দ্রসুন্দরও তেমনই বাঙ্গালার উপকরণে বাঙ্গালার পুজা করিতেন, বাঙ্গালার ভাবে বাঙ্গালার সাধনা করিতেন। অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় ক্লাসে অধ্যাপনা করিতেন। প্রিন্সিপাল রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ ধুতী চাদর পরিয়া রিপণ কলেজে অধ্যক্ষতা করিতেন।"

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে তাঁর রোল মডেল ছিলেন সে কথা রামেন্দ্রসুন্দর চরিতকথা গ্রন্থে বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত প্রবন্ধে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য হল, সাধারণ বাঙালির চরিত্রে যে পৌরুষ, দৃঢ়তা ও চরিত্রবলের একান্ত অভাব বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তা প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষাতেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়—

''রত্নাকরের রাম নাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা মরা-মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক নজিরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙ্গালী জাতির প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। লক্ষ্মণসেনঘটিত প্রাচীন কিংবদন্তীটা অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পলাশির লড়াইয়ের কিছুদিন পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষায় এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময় কুণ্ঠিত হইতে হইবে।"

বিদ্যাসাগর ছিলেন মানবতাবাদী ও সংস্কারবাদী। সমস্ত রকম বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তিনি নির্ভীক চিত্তে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন স্বদেশপ্রীতির মুখ্য রূপকার। চরিতকথায় বঙ্কিম প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত সাগর মন্থন করে যে মূর্তিকে স্বদেশশ্রেণীর সামনে স্থাপন করেছিলেন, তা যুগধর্ম প্রবর্তকের মূর্তি, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতীক। রামেন্দ্রসুন্দর যথার্থই লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে ও কৃষ্ণচরিত্রে আমরা যুগধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দেশবাসীর কাছে যুগধর্মের আবশ্যকতা নির্দেশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন একই সময়ের প্রতিনিধি। দু'জনের মধ্যে গভীর আত্মিক সম্পর্ক ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ অকপটে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন। তাঁর ভাষায়—

''হে মিত্র, পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি। যখন নবীন ছিলে, তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্রমুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্তিতে তুমি অমর,

আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।"

সাহিত্য ও স্বদেশ সাধনা

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন শিক্ষাবিদ ও বৈজ্ঞানিক। কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় হল তিনি ছিলেন দার্শনিক ও স্বদেশপ্রেমিক। তাঁর সাহিত্যসাধনা শুরু হয়েছিল বিজ্ঞানের রাজপথ ধরে। কিন্তু তাঁর সার্থকতা ছিল স্বদেশ চেতনার অনুসন্ধানে। এই জন্য তিনি বেদ-ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক-উপনিষদের অতীত ভারতবর্ষের রহস্য উন্মোচনে সচেষ্ট হন। আলোকসম্পাত করেছেন অতীত যুগের বেদপন্থীদের ক্রিয়াকর্ম, সিদ্ধি-সাধনা ও যাগযজ্ঞের উপর। রামেন্দ্রসুন্দরের ভারতের ঐতিহ্য অনুসন্ধানের পরিচয় পাই তাঁর লেখা কর্মকথা গ্রন্থে (১৩২০ বঙ্গাব্দ)। বেদজ্ঞ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে মুক্তিবাদই ভারতের জনসমাজকে একদা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বেদপন্থী ভারতপথিক। ভারত সাধনার পথ ধরেই মুক্তিপথের অভিযাত্রী হয়েছিলেন।

প্রাচীন ইউরোপের খৃস্টান ধর্মপন্থা নয়, আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ নয়, বৈদিক ভারতের মোহমুক্ত কল্যাণব্রত ছিল তাঁর জীবনদর্শন। কর্মকথার শেষ প্রবন্ধ 'যজ্ঞ' ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের স্বধর্মনিষ্ঠা ও সমাজ কল্যাণব্রতের প্রতিফলন।

''যে শাশ্বতী বাণী, যে সনাতন শব্দ বিশ্ববিধাতার চতুর্মুখ হইতে সমীরিত এবং যুগে যুগে ঋষিমুখে প্রচারিত ও মহাজনক কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়া এই প্রাচীন সমাজে লোকস্থিতির সহায় হইয়াছে, যে সনাতন ধর্ম সহস্র বিপ্লবে এই পুরাতন সমাজকে ধারণ করিয়া আসিতেছে এবং বহু অনার্য্য আক্রমণ সত্ত্বেও এই আর্য্য সমাজের বিশুদ্ধি ও বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছে, সেই বাণী, সেই শব্দ, সেই ধর্ম আমাদের এই বিপত্তির দিনে পথ প্রদর্শক হউন। স্বধর্মে রক্ষিত হইলেই আমরা রক্ষিত হইব— ইহাই এই ক্ষুদ্র লেখকের ধ্রুব বিশ্বাস। আর যদিই বা নিয়তির প্রেরণায় আমরা রক্ষিত না হই, যদিই বা মহাকালের চক্রতলে পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনের ধ্বংস হইবে, ইহাই আমাদের নিয়তি হয়, তাহা হইলে আমাদের আর্য বিশিষ্ট ভাব রক্ষা করিয়াই যেন আমরা বিনষ্ট হই, ইহাই প্রার্থনা— কেন না, ভগবান অঙ্গুলিসঙ্কেতে উপদেশ দিতেছেন— স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।"

দেশমাতৃকার সাধনার ব্রতকথা

১৯০৫ সাল— স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'বঙ্গ বিরোধী বিপ্লবের' সূচনা হল। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধে সারা বাংলা জুড়ে প্রতিবাদের ঢল বয়। এই সময়ের স্বদেশপ্রীতির ভাববন্যাকে আশ্চর্যভাবে ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' ধ্বনিত হল দ্বিখণ্ডিত বাংলা মায়ের মর্মবেদনায়। রামেন্দ্রসুন্দর যুগযন্ত্রণাকে পরিস্ফুট করেছিলেন অনবদ্য ভঙ্গিতে। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা'য় যেমন উদ্দীপনা ধ্বনিত হয়েছিল, 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' ছিল বাঙালি মানসের জীবন্ত প্রতিফলন।

'বন্দেমাতরম্। বাংলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ-কাশী পার হয়ে মা পূর্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হলেন।

শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলাদেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু, গালভরা হাসি হল। লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগল।

'লক্ষ্মী দেখলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, আর আমার নিতান্তই বাঙলায় থাকা চলল না। আমার হিঁদু যেমন, মোছলমান তেমনি। হিঁদু-মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হল, তখন আর আমার বাঙালায় থাকা চলল না।

'বাঙলার মেয়েরা ঐদিন (তিরিশে আশ্বিন) বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। ঘরে ঘরে সেদিন উনুন জ্বলল না। হিঁদু মোছলমান ভাই-ভাই কোলাকুলি করলে। হাতে হাতে হলদে সুতোর রাখী বাঁধলে। ঘট পেতে বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনলে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।'

রামেন্দ্রসুন্দর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ চাননি। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বাংলায় মুসলমান তোষণনীতি শুরু করল এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনে ইন্ধন জোগালো।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রয়াণের পর শোকসভায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'বিদ্যার জাহাজ ডুবিয়া গেল।" কিন্তু বাংলায় সারস্বত সাধনায় রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতি এখনও অমলিন।

আমাদের সার্বিক অবক্ষয়ের কারণ জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণে ব্যর্থতা

দেবীপ্রসাদ রায়

শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য চিন্তা-ভাবনার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। ভারতীয় ধারণায় শিক্ষার লক্ষ্য পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠা এবং মানব প্রজাতির তথা বিশ্বের সকলের কল্যাণসাধনে ব্রতী হওয়া। বিবেকানন্দ খুব সুন্দরভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছেন— মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্ব বা দেবত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা ভূমিকা হল সেই দেবত্বের বিকাশ সাধন করা। আমরা শ্রীঅরবিন্দের চিন্তায়ও এই ধারণারই প্রকাশ দেখি, Life Divine রচনায় আবার রবীন্দ্রনাথের Religion of Man গ্রন্থেও এই একই অভিব্যক্তি বর্তমান। অপর দিকে পাশ্চাত্য চিন্তায় শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন— বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগে ভোগ্যবস্তুর যোগান ও চাহিদা বাড়ানো। ভোগবাদকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার ব্যাপ্তি— ভোগবাদকে কেন্দ্র করেই জীবনদর্শন, যা অনিবার্যভাবে সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাতাবরণ সৃষ্টিতে প্রেরণা যোগায়, যা সংঘর্ষের বা শ্রেণী সংগ্রামের দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে, যা মানুষকে ভোগবাদী দর্শনসঞ্জাত যুক্তির পথে ঠেলে দিয়ে অর্থনৈতিক জন্তুতে পরিণত করে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার বা নিজগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নটিই তখন বড় হয়ে দাঁড়ায়, এবং বিশ্বমানবের সামগ্রিক কল্যাণের পরিবর্তে মানব সমাজের একাংশের সীমিত কল্যাণ শিক্ষার লক্ষ্যকে সংকীর্ণ করে

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

তোলে। পৃথিবীর নব্বই শতাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ পাশ্চাত্যের গুটিকয়েক দেশের ভোগবাদের চাহিদা মেটায়। বাকি বিশাল অংশের জন্য থাকে প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্র দশ শতাংশ। অসম এই ব্যবস্থায় যে ক্ষতিকর পরিণাম হওয়ার কথা, বিশ্ব আজ সেই পরিণতির দিকেই ধাবমান। সভ্যতার মাপকাঠি হয়েছে নতুন নতুন ভোগ্যবস্তুর সৃষ্টির পারগতা, অন্যের ন্যূনতম চাহিদার প্রতি উদাসীন থেকে সেই ভোগ্যবস্তুকে আয়ত্তে আনা— যে যত বেশি ভোগ করতে পারবে, যেন সেই-ই তত বেশি সভ্য। দীর্ঘ শাসন এবং শোষণের ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মানুষের ভাবনাচিন্তার গভীরে সভ্যতার ঐ মাপকাঠি স্থান করে নিয়েছে। ভারতও সেই প্রভাব থকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেনি। যদিও স্বামীজী সুস্পষ্ট ভাষায় সভ্যতার সংজ্ঞা নির্ধারিণ করে দিয়েছিলেন— ...The process of civilisation is the process of reducing selfishness।

সদ্য বিদেশী শাসন ও শোষণমুক্ত ভারতে মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করার জন্য, সংকীর্ণ স্বার্থপরতাকে বিদূরিত করার জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার দরকার ছিল, তা হয়ে উঠতে পারেনি। সম্ভবত তাৎক্ষণিক বিশ্ব আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের কারণে। এই তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে যে শিক্ষানীতি গৃহীত হল তা ১৮৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড মেকলের 'minute' ভিত্তিক প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এমন কিছু আলাদা নয়। বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় মেকলের 'minute' -এর প্রভাব তো ছিলই আরও ছিল মেকলের বোন চার্লস ট্রেভেলিয়ন-এর Notes on Indian Education -এর দূরদর্শিতার স্বাক্ষর। স্বাধীনতার পর নিয়োজিত একের পর এক শিক্ষা কমিশনগুলি কিছুতেই এই প্রভাবগুলি থেকে মুক্ত হতে পারছিল না। অনেকের ধারণা ছিল বা এখনও আছে ভারতীয় শিক্ষা চিন্তায় যেন সুবিন্যস্ত কোনো পরিকাঠামো-ধারণা ছিল না। যদৃচ্ছভাবে থাকা গুরুমুখী ব্যবস্থা বা টোলব্যবস্থা ছাড়া। অবাক হতে হয়, যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে দেশবিদেশের দশ হাজার আবাসিক ছাত্র ছিল, সেই নালন্দা, বিক্রমশীলা, অবন্তীপুর, তক্ষশীলা ইত্যাদির কথা তাঁদের মনে হয়নি কি? ধর্মমত নির্বিশেষে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত ঐ ধরনের উঁচুমানের শিক্ষাকেন্দ্রের কথা এখন কি আমরা ভাবতে পারি না? তাহলে বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে ভারতীয় পরম্পরায় ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়নি কেন? আর এই না ভাবার কারণেই ভারতীয় শিক্ষাদর্শনকে তুলে ধরা, প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। পাশ্চাত্য ব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণ তথাকথিত সভ্যতার উপকরণ সৃষ্টিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রার সাফল্য আনলেও শিক্ষার মূল ভারতীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তা ব্যর্থ হয়েছে। আশির দশকের শুরুতেই বিগত শিক্ষা কমিশনগুলির ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপক সমীক্ষা চালানো হয়। অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ এই সমীক্ষার ফলেই ১৯৮৫ সালে প্রস্তুত হয় 'Challenge of Education-- a Policy Perspective' নামে খসড়া দলিলটি। দেশব্যাপী ব্যাপক তর্কবিতর্কের শেষে ১৯৮৬ সালে সংসদে গৃহীত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি। দেশবাসী এই প্রথম ভারতীয় পরম্পরাকে গুরুত্ব দিয়ে ও স্মরণে রেখে শিক্ষানীতি প্রণয়নের এক উদ্যোগ দেখে খুশি হল। সমীক্ষাতে স্বীকৃত হল— ... 'It is aslo a truism that the nation would not move towards the twenty first century on two legs unless illiteracy is vanished and a uniform learning environment is created'। বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণে উপলব্ধ হল '....The country now stands on the threshhold of the twenty first century. Those who are being born now will finish their elementary schooling at the turn of the century and enter into a world which will, it is already clear, offer opportunities, unprecedented in the history of mankind to those who are equipped to copy with the future challenges and the accelerating pace of change'।

এই উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতেই সংসদে গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে অগ্রাধিকার পেল কয়েকটি সুপারিশ।

১৯৮৬ সালে সংসদে গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে সংগৃহীত তথ্য ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী যে সুপারিশগুলি রাখা হয়েছিল সেগুলি হল—

১) প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনকরণ।

২) বয়স্ক এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রসার এবং নিরক্ষরতার অবসান।

৩) মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের বাছাই করে গ্রাম, শহর, বর্ণ, ধর্ম এবং আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে তাদের মেধাবিকাশের জন্য সর্বোত্তম সুযোগ প্রদান, যাতে করে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে।

৪) পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারসাধন, শিক্ষাপদ্ধতির মানোন্নয়ন, কর্মনিযুক্তির সাথে ডিগ্রির সম্পর্কের বিযুক্তিকরণ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

৫) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

৬) সম্পদ সংগ্রহ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সুচারু ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন।

আরও একটি দিক ছিল খসড়া দলিলে, যা শিক্ষা তথা গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূণ। সেটি হল— ভারতের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের কালোপযোগী ব্যবহার। এ সম্পর্কে খসড়া দলিলের পঞ্চম অধ্যায়ের তেত্রিশতম ধারায় আছে— "Research in Indology, the humanities and social sciences will receive adequate support. To fulfil the need for the synthesis of knowledge inter-diciplinary research will

be encouraged. Effort will be made to delve into India's ancient fund of knowledge and to relate it to contemporary reality. This effort will imply the development of facilities for the intensive study of Sanskrit and other classical languages"।

জাতীয় শিক্ষানীতি, ১৯৮৬-র রূপায়ণ কতটা সদর্থকভাবে হচ্ছে তা বিচার করার আগে একটা জিনিস অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রস্তুতিপথে তথ্য সংগ্রহে যে নিষ্ঠা দেখা গেছে তা সত্যিই অভূতপূর্ব এবং এই নিষ্ঠাই স্বাধীনতার পর তিন দশক ধরে অনুসৃত শিক্ষা ব্যবস্থার যে ত্রুটিগুলি অদৃশ্যপ্রায় ছিল সেই ত্রুটিগুলিকে সাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছে। প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনকরণে প্রথমেই নেওয়া হয়েছিল এক কর্মসূচি, যার নাম 'Operation Blackboard'। প্রায় অধিকাংশ রাজ্যই এই কর্মসূচিকে অর্থাগমের উপায় হিসেবে গণ্য না করে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ায় দশ বছরের মধ্যেই জাতীয় সাক্ষরতার হার ১৫.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছিল বলে সেন্সাস রিপোর্টে প্রকাশ। তার আগের ত্রিশ বছরের গড় হার ছিল ১১.৫৬ শতাংশ, 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড'-এর অধীনস্থ 'একটি গ্রাম, একটি প্রাথমিক স্কুল' দু-একটি বাদে সব রাজ্যেই সফল হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণের প্রচেষ্টায় প্রায় সব রাজ্যেরই প্রাপ্তি আশাব্যঞ্জক। স্কুলছুটদের সংখ্যা গ্রামাঞ্চলে (আংশিকভাবে শহরেও কোনো কোনো এলাকায়) একটি গুরুতর সমস্যা ছিল— নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণে রাজ্যগুলির সহযোগিতায় তার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের ২০০০-২০০১ সালের রিপোর্টে স্কুলছুটদের সংখ্যা শতকরা হিসেবে হরিয়ানাতে ১৪.৫৭, মধ্যপ্রদেশে ১৯.০০, মহারাষ্ট্রে ২০.২৯, পাঞ্জাবে ২২.৪৯, অন্ধ্রপ্রদেশে ৪০.২৮, তামিলনাড়ুতে ৪১.১০, রাজস্থানে ৫২.৫৩, ওড়িশাতে ৩৬.১২ আর পশ্চিমবঙ্গে ৫৪.৩৭। প্রাথমিক স্তরে স্কুলছুটদের সর্বভারতীয় গড় ৪০.২৫ শতাংশ। প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় উপযুক্ত উদ্যোগ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়ায় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অগ্রগতির লক্ষণ নির্দিষ্টভাবেই দেখতে পাওয়া গেছে। Model School ধারণার বিরুদ্ধে কোনো কোনো রাজ্যের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও এগুলিতে পড়ার সুযোগ যারা পেয়েছে, তাদের মধ্যে ৪০ শতাংশ দারিদ্রসীমার নীচে থাকা পরিবারের ছাত্রছাত্রী। অনতিকালের মধ্যেই জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণের সাফল্য নির্দেশিত হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে। প্রাপ্তিগুলিতে বিশ্বে সফট্ওয়্যার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের প্রবল এবং অনিবার্য উপস্থিতি এবং স্বীকৃতি তার প্রমাণ।

জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণের প্রাথমিক স্তরে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি লক্ষ্যপূরণের সহায়ক হচ্ছে দেখেই দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে মানবসম্পদ বিকাশ তথা শিক্ষামন্ত্রক। দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি জাতীয় শিক্ষানীতিতে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হওয়া খসড়া দলিলের পঞ্চম অনুচ্ছেদের তেত্রিশতম ধারাকে কেন্দ্র করেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুদূর অতীতের উজ্জ্বল ইতিহাস ভারতের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করবে— এই ধারণাই দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রচেষ্টার চালিকাশক্তি ছিল। ভারতের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারকে সার্থকভাবে ব্যবহার করার কেন্দ্রে রয়েছে সংস্কৃত ভাষা চর্চার বিস্তৃতকরণ। কারণ, উক্ত জ্ঞানভাণ্ডার সংস্কৃত ভাষাতেই বিধৃত আছে। আর একটি পদক্ষেপ নিয়েছিল মন্ত্রক, সেটি হল জ্যোতিষবিদ্যাকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিকাঠামোর মধ্যে এনে তাকে পাঠ্যবিষয় করা। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই পদক্ষেপগুলি নিয়েও যথেষ্ট হৈচৈ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। বলা হচ্ছিল, দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া, দেশের সাধারণ মানুষকে অবৈতনিক মনোভাবাপন্ন করা— এসবই নাকি এর উদ্দেশ্য। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ এই কলরবে সামিল হলেও দেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু পদক্ষেপগুলিকে স্বাগত জানিয়েছিল। তারা মনে করছিল, জাতীয় শিক্ষানীতিতে জাতির সংস্কৃতির এবং সভ্যতার স্পর্শ থাকা দরকার। তাকে বাদ দিয়ে বা গৌণ করে দিয়ে বিদেশী সংস্কৃতি, ইতিহাস অথবা বিদেশী জীবনাদর্শকে গ্রহণীয় করে তোলার কৃত্রিম চেষ্টা একান্তভাবে অবাঞ্ছিত। স্বাধীনতার পর প্রায় তিন দশক ধরে এই ত্রুটির প্রতি যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়নি। জাতীয় শিক্ষানীতি এই ত্রুটিকে চিহ্নিত করতে পেরেছে দেখে দেশবাসী খুশি হয়েছিল। কিন্তু তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়াসের শুরু থেকেই প্রবল বিরোধিতা শুরু হয়। বলা বাহুল্য, এই বিরোধিতা বামপন্থীদের বিশেষ করে কমিউনিস্ট দলগুলির, বিজাতীয় দর্শনই যাদের একমাত্র উপজীব্য। একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি তৎকালীন এন ডি এ সরকার অনুসৃত জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণে গতি সৃষ্টি করতে চাইল যাতে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারকে সমসাময়িক কালের বাস্তবতার নিরিখে সার্থকভাবে ব্যবহার করা যায়। দু'টি পদক্ষেপ নেওয়া হল— (১) সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা গবেষণার ব্যাপক প্রয়াস, কারণ ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার ঐ ভাষাতেই লিপিবদ্ধ আছে এবং (২) প্রাচীন জ্যোতিষবিদ্যা যা বেদাঙ্গের অঙ্গীভূত ছিল, তাকে বিষয় হিসেবে পাঠক্রমে এনে তার বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করা। কিন্তু দু'টির ক্ষেত্রেই প্রবল বিরাধিতা করা হল। সংস্কৃতকে মাতৃভাষা এবং প্রগতিশীলতার পরিপন্থী গণ্য করে একে শিক্ষার গৈরিকীকরণের অবলম্বন অভিহিত করে এবং জ্যোতিষকে অবৈজ্ঞানিক বুজরুকি আখ্যা দিয়ে। এর কোনোটিই সত্য নয়। কারণ সংস্কৃত বিশ্বের প্রাচীনতম এবং সমৃদ্ধ ভাষা। একে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন আম্বেদকর। জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, 'যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে, ভারতের সব থেকে মূল্যবান গচ্ছিত সম্পদ কি? তবে নিঃসঙ্কোচে আমি বলব সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

—ঃ সৌজন্যে ঃ—

মনমোহন চৌধুরী

Telegram :LIBRAJUT
e-mail : cil@ho.champdany.co.in
Web : www.jute-world.com

Phone : 2237-7880 to 85
2225-1050/7924/8150
Fax : 91 (33) 2225-0221
91 (33) 2236-3754

Libra Exporters Ltd.

Manufacturers, Exporters, Importers & Commission Agents

Works :- P.O. Choudwar, Dist.
Cuttack, Odisha - 754-025
Ph (0671) 2394304, 2394356,
2394267

REGD. Off.
33, C. R. Avenue
8th Floor
Kolkata - 700 012

ADMN. Off.
G.P.O Box 2539,
25, Princep Street,
Kolkata - 700 072

সাহিত্য আর সংস্কৃতের সম্যক জ্ঞান।' আমরা কি জানি, টমাস আলভা এডিসন তাঁর আবিষ্কৃত রেকর্ডিং যন্ত্রে প্রথমে যা রেকর্ড হয়েছিল তা সংস্কৃত মন্ত্র-ঋক বেদের শ্লোক, আবৃত্তি করেছিলেন ম্যাক্সমুলার। ২০১১ সালে ৬-১০ জানুয়ারি ব্যাঙ্গালোরে সংস্কৃত পুস্তক মেলা হয়েছিল। দৈনিক গড় বিক্রয় সওয়া কোটি টাকার সংস্কৃত বই। শুধু গীতাই পাঁচদিনে বিক্রি হয়েছিল পঁচিশ লক্ষ টাকার। সংস্কৃত মৃত ভাষা, মানুষ সংস্কৃতে অনাগ্রহী। সেই ভাষা পঠন-পাঠন ও গবেষণা নাকি গৈরিকীকরণের প্রয়াস। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক চালু করতে চাওয়া হয়েছিল, তা নাকি গৈরিকীকরণের পক্ষে সেকুলারিজম বিরোধী প্রয়াস। জ্যোতিষ পাঠক্রমে এর পঠন-পাঠন গবেষণার সূত্রপাত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল— তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, এটা নাকি পশ্চাদ্গামিতা, বুজরুকি, কুসংস্কারকে উৎসাহ দেওয়া। প্রাচীন ভারত গণিতবিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। গণিত ছয় বেদাঙ্গর একটি অঙ্গ। জ্যোতিষ চর্চার অধিকারী হত তারাই যারা গণিতে পারদর্শিতা অর্জন করত। এবং গণিত প্রাচীন পণ্ডিতদের মূল্যায়নে ছিল ঃ

যথা শিখাময়ূরানাং নাগানাং মনয়ো যথা।
তদ্বেদাঙ্গ শাস্ত্রানাং গণিতং মূর্দ্ধাণ স্থিতম্।।

— অর্থাৎ যে কেউ মনে করলেই জ্যোতিষচর্চা করতে পারত না। কালের প্রভাবে রাজনৈতিক উথাল-পাতালের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবে জ্যোতিষ চর্চা স্ব-মান ও মহিমা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। যে কেউ পেশা হিসেবে নিয়ে এর কৌলিন্য নষ্ট করে দেয়। কিন্তু ছয়-সাত হাজার বছর ধরে চর্চিত এবং স্বীকৃত একটি বিষয়কে নিজেদের অজ্ঞতায় অথবা খণ্ডিত প্রজ্ঞার আলোছায়ায় অবিজ্ঞান বলাটাই কি বিজ্ঞানসম্মত? জ্ঞানের স্রোতধারা 'জ্যোতিষ' উপযুক্ত পরিকাঠামোহীন ভাবে চর্চিত হওয়ার কারণে হয়তো দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে জ্ঞানের মহাসমুদ্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উপযুক্ত অনুশীলনে এবং পর্যবেক্ষণে জ্যোতিষজ্ঞানের স্রোতধারাকে জ্ঞানের মহাসমুদ্রে আনা যাবে না একথা কি বলতে পারা যায়? বেদের অঙ্গ হিসেবে আয়ুর্বেদ যদি মানুষের কাছে স্মরণাতীতকাল থেকে আস্থাভাজন ও বিজ্ঞানসম্মত হয়, সেই একই লোকেদের দ্বারা চর্চিত বেদাঙ্গ জ্যোতিষ কেন অবহেলিত হবে আজ? এই চর্চার বিরোধিতাটাই কি অবৈজ্ঞানিক নয়? চর্চায়, গবেষণায় এক 'অজানা খনির নতুন মণির হার'কে পাওয়ার সম্ভাবনা রোধ করা হবে কেন? হারিয়ে যাওয়া সরস্বতী নদীকে মরুভূমির তলায় চিহ্নিত করেছে উপগ্রহ— আমেরিকা ও ফ্রান্সের, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সেই সঙ্কেতে অগ্রসর হয়ে মাটির গভীরে হারিয়ে যাওয়া নদীর খাতের থেকে জল তুলে এনে তাকে পেয়, পানীয় বলে মতামত জানিয়েছেন। সে তো বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেই। বিরোধীরা সংস্কৃতচর্চা ও জ্যোতিষ তথা বিভিন্ন পাঠক্রম চালু করার প্রয়াসের বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টেও গিয়েছিল এন সি ই আর টি-র বিরুদ্ধে, সি এ বি ই (সেন্ট্রাল অথরিটি বোর্ড অফ এডুকেশন)-কে কাজে লাগিয়ে রিট পিটিশন নং ৯৮/২০০২ করে। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে— ".... Therefore to say NCERT did not consult any one is unfare and ignorance of facts if not suppression of facts..."। ১৯৮৬ সালে সংসদে গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতি বহু প্রতীক্ষিত জাতীয় প্রত্যাশা পূরণের যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল তা ভাঙতে বামপন্থীরা উদ্যোগ নিয়েছিল তারপর থেকেই। ভারতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষানীতি রূপায়ণকে তারা সংবিধানবিরোধী এবং সেকুলারিজম বিরোধী বলে সারা দেশ জুড়ে হৈ-হট্টগোল বাধিয়েছিল। জাতীয় শিক্ষানীতির পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের পদ্ধতিতে ১৯৯৬ সালে সাংসদ এস বি চ্যবনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশ ছিল— "Under the invasion of Western culture penetrating into India through the media, the young are being literally moved away from our age old traditions and values. Any attempt to instil indigenous value in students in school colleges are over shadowed by the overwhelming impact of Western culture. The committee is of the considered view that stringoent efforts are required on the part of the Government to monitor the programme being aired telecast through its media. Similar steps need to be taken so as to have a machanism of quality control of programmes under the control of private agencies too"।

এন ডি এ-র আমলে NCERT এই মূল্যবোধই ফিরিয়ে আনার যে প্রয়াস নিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট তার বিরুদ্ধে যায়নি "..For the reasons given above we do not find the national educational policy 2002 runs counter to the concept of secularism"। এবং সবশেষে অরুণা রায় এবং অন্যান্যদের আনা অভিযোগ খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে—

Order : In the result, the writ petition is dismissed. There shall be no order as to costs.

sd. M. B. Shah

D. M. Dharmadhikari

H. K. Sema।

এস বি চ্যবন কংগ্রেস সাংসদ ছিলেন। অথচ সি পি এম তথা বামপন্থীদের সহায়তায় ক্ষমতা দখলের জন্য বহু প্রতীক্ষিত শিক্ষানীতির দ্বারা সুস্থ সুন্দর ভারতীয় মূলবোধভিত্তিক সমাজ গঠন এবং সেই সংক্রান্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে বামপন্থী ঈপ্সিত কর্মধারাকে মদত যোগালো ইউ পি এ

সরকার। শুধু তাই নয়, বামপন্থীদের সন্তুষ্ট করতে এন সি ই আর টি-র ডিরেক্টর ড. জে এস রাজপুতকে ইউনেস্কো শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করেছিল ১৮০টি দেশের প্রতিনিধির মধ্যে। তাকে বানচাল করার জন্য তড়িঘড়ি একটা তদন্ত কমিটি করে ড. রাজপুতের এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়ার পথকে কণ্টকিত করল বিশ্বের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও। এরপর কৃতকর্মের সংশোধন না করে জাতীয় শিক্ষানীতিকে সামনে রেখে তাকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের পথে চালিত করল ইউ পি এ-র মানবসম্পদ মন্ত্রক। প্রচুর টাকা খরচ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কর্পোরেট সেক্টরে পরিণত করা হল। শিক্ষাকে মহার্ঘ্য পণ্যে পরিণত করা হল। পাশ্চাত্য ছাঁচে ফেলার জন্য স্কুল শিক্ষায় যৌনশিক্ষা ঢোকানো হল। বাড়ির ছেলেমেয়েদের যাতে বাবা-মা শাসন করতে না পারে ভারতীয় সামাজিক বন্ধন ও ঐতিহ্যের পরম্পরায়, তার জন্য আইন প্রণয়নে উদ্যত আজ— পাশ্চাত্যে আছে যে! পাশ্চাত্যের সমাজব্যবস্থায় স্বল্পস্থায়ী পরিবারে উদ্ভূত সন্তান সন্ততিদের সুরক্ষার জন্য আইন আছে, দরকারে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় তার প্রয়োজন আছে কি— তবুও সেই দিকে যেতে হবে, পাশ্চাত্যে আছে যে! যৌনশিক্ষা পাঠক্রমে রাখতে হবে, পাশ্চাত্যে আছে যে! সেখানে মা মেয়েকে ডেটিং-এ পাঠাচ্ছে গর্ভনিরোধক পিল খাইয়ে (ওপার বাংলা - এপার বাংলা, শঙ্কর)। আমাদের পরিবারেও এগুলি চালু করতে হবে— পাশ্চাত্যে আছে যে! স্ত্রীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সাংসারিক কাজ করতে হবে— এ চিন্তাও নীতি নির্ধারকদের মাথায় আছে। শিক্ষাব্যবস্থার জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থার চাইতে অর্থনৈতিক জন্তু তৈরি করার ব্যবস্থা আছে। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে অর্থনৈতিক জন্তু হওয়ার লক্ষ্যে— পারিবারিক দায়-দায়িত্ব বোধবিহীন, অন্যজন বা সমাজের জন্য ভাবনা-চিন্তা রহিত হয়ে নিজের অর্থনৈতিক প্রাপ্তিকে ধ্যানজ্ঞান করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নতির ফসল ভোগ করতে একাগ্র এবং নির্বিকার চিত্ত ছেলেমেয়েই কি কাম্য আমাদের! পাশ্চাত্য ভোগবাদী শিক্ষার অনুকরণ যে বিপর্যয় ডেকে আনছে তার কথা ভেবেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ‘লাইফ ডিভাইন’ গ্রন্থে বলেছেন— 'Man has created a system of civilisation which has become too big for his limited mental capacity and understanding and his still more spiritual and moral capacity to utilise and manage a too dangerous servant of his blundering ego and apetites'।

এই অর্থনৈতিক জন্তুর সমাজ যাতে গড়ে না ওঠে তার জন্যই বিবেকানন্দ বৈদান্তিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন। লাল শালু থেকে তাই তিনি বেদান্তকে সাধারণের

মেকলে

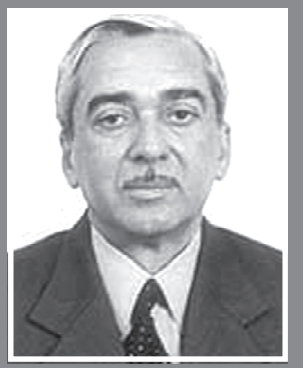

জে এস রাজপুত

পাশ্চাত্য শিক্ষাধারায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় বড় হওয়া মানুষরা ভারতীয় শিক্ষানীতির নিয়ামক হয়ে সব সুপারিশ বাতিল করে শিক্ষাদর্শের চেহারারই পরিবর্তন ঘটালেন। যে নৈতিক শিক্ষাগুলি ভারতীয় শিক্ষাদর্শের প্রাণ ছিল, সেগুলির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটানো হল। তারই ফল এই অবক্ষয়, এই বিষবৃক্ষের উদ্ভব ও পুষ্টি।

আগ্রহের মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন যাতে ভোগবাদী পাশ্চাত্য দর্শনের অপ্রতিরোধ্য অভিঘাতকে সামাল দেওয়া যায় আমাদের জীবনচর্যায়। বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ জন্মজয়ন্তীতে দরাজ হাতে শুষ্ক অনুষ্ঠানের জন্য টাকা দিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চিন্ত, অথচ কাজে বিবেকানন্দকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাদর্শকে জলাঞ্জলি দেওয়া চলছেই। আমাদের ভারতীয় জীবনচর্যার পরম্পরায় অত্যন্ত স্তিমিত হয়ে এলেও 'মানুষ' হয়ে ওঠার প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারেই পাওয়া যেত ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে। পরার্থপরতা জন্মাত, পারিবারিক দায়িত্ববোধ জন্মাত, অন্যদের জন্য ভাবনা করার প্রবণতা জন্মাত, ন্যায়-অন্যায় বোধের শিক্ষা হয়ে যেত। পাশ্চাত্য অনুকরণের খাতে সেইসব পারিবারিক শিক্ষা উধাও হতে বসেছে। আজ প্রতিদিন সামাজিক অবক্ষয়ের যে ছবি পাচ্ছি, প্রতিনিয়ত তার জন্য এই ক্রমবর্ধমান পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণই দায়ী। এরজন্য আক্ষেপ করা, দূরদর্শনে বাদানুবাদ করা, মহামিছিলে সামিল হওয়া— এসবের চাইতে অত্যন্ত জরুরি কী করে ভারতীয় মূল্যবোধ সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা যায়। হবে না হবে না নয়, কীভাবে হবে তা নিয়ে আন্তরিক আলোচনার উদ্যোগ চাই, প্রচেষ্টা চাই, প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত হওয়া চাই। চাই আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্যই। রাজনৈতিক নেতাদের উপর কোনোরকম নির্ভরতা না রেখেই ভাবতে হবে। কারণ, অভিজ্ঞতা বলছে, ক্ষমতার লোভে বাহ্যজ্ঞান এবং কাণ্ডজ্ঞান হারানোটাই দৃশ্যমান এক ব্যতিক্রমহীন বাস্তব। খুব দুঃখের কথা, হতাশার কথা এই যে, বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষে যারা এই সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি তুলতে পারতেন সেইসব বিশিষ্ট বিবেকানন্দ অনুরাগী ব্যক্তি, আশ্রমের মহারাজ, খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী শুধু ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রচারের জন্য ফটো তুলিয়ে, ঝকমকে স্মারকপত্রে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ছাপিয়েই পরম তৃপ্তিলাভ করলেন। তাঁরা কেউ বললেন না, শিক্ষা-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণ বন্ধ করা হোক, অর্থপূর্ণভাবে কেউ স্মরণ করলেন না বিবেকানন্দের সেই সাবধান বাণী— 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাসসুলভ দুর্বলতা... এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে?' কেউ শিক্ষানীতির সরকারি নিয়ামকদের স্মরণ করিয়ে দিলেন না, ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া দলিলের পঞ্চম অধ্যায়ের তেত্রিশতম ধারায় সুপারিশগুলো (পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে)। কেউ স্মরণ করিয়ে দিলেন না ১৯৯৬ সালে এস বি চ্যবনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশের (পূর্বে উল্লেখিত) কথা। পাশ্চাত্য শিক্ষাধারায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় বড় হওয়া মানুষরা ভারতীয় শিক্ষানীতির নিয়ামক হয়ে সব সুপারিশ বাতিল করে শিক্ষাদর্শের চেহারারই পরিবর্তন ঘটালেন। যে নৈতিক শিক্ষাগুলি ভারতীয় শিক্ষাদর্শের প্রাণ ছিল, সেগুলির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটানো হল। তারই ফল এই অবক্ষয়, এই বিষবৃক্ষের উদ্ভব ও পুষ্টি। বিবেকানন্দ অনুরাগী কেউ বললেন না, বিবেকানন্দ প্রস্তাবিত শিক্ষাদর্শকে কেন্দ্রীয় সরকার বিবেকানন্দ চর্চা-গবেষণায় ও রূপায়ণের পথে না গেলে আমরা আমাদের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে তা চালু করব। ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের সমস্যা হল, সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অবদান গ্রহণ করতে হবে ততটা, যতটা সমাজ জীবনকে কলুষিত না করতে পারে। আর তার জন্য অধ্যাত্মচর্চাও চাই। কিন্তু আমরা যা দেখছি, তাহল ভারতীয় জীবনচর্চায় অধ্যাত্মবাদের পরম্পরাগত যে প্রভাব আছে, তাকে আপাতভাবে অবলম্বন করে ভোগবাদ গ্রহণেরই চাতুর্যপূর্ণ পন্থার অনুসরণ ও অবলম্বন। তার ফলেই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান, সুগম্ভীর বক্তৃতা হলেও সকলের জন্যই একান্ত প্রয়োজনীয় সুস্থ সুন্দর নির্ভরযোগ্য সমাজ গঠনের প্রয়োজনটা যথাযথ গুরুত্বসহ অনুভূত হচ্ছে না। তাই প্রতিদিনের তলিয়ে যাওয়াটা গোপন রাখার প্রয়াস করছি অনুষ্ঠান সর্বস্বতার মাধ্যমে। আমরা মনে প্রাণে চাই এর প্রতিকার হোক। স্বাধীনতার পর এই প্রথম প্রকৃত জাতীয়তাবাদী সরকার এসেছে কেন্দ্রে। আমরা সাগ্রহে অপেক্ষমান।

A

Well

Wisher

প্ল্যাটফর্মের ধার ঘেঁষে অথবা রেললাইনের আশেপাশে ফোনে কথা বলা অথবা গান শোনা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সম্প্রতি রেললাইন পার হওয়ার সময় ফোনে দলবেঁধে কথা বলার জন্য দুর্ঘটনায় কয়েকটি জীবনহানি ঘটেছে। অযথা ঝুঁকি নেবেন না। নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মেনে চলুন ঃ

- প্ল্যাটফর্মের ধার ঘেঁষে চলার সময় কখনোই মোবাইলে কথা বলবেন না অথবা গান শুনবেন না।
- রেললাইনে হাঁটা বা হেঁটে পারাপার করা বিপজ্জনক। এটি একটি নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ।
- রেললাইন অথবা ট্রেনের কাছ থেকে সর্বদা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।

মনে রাখবেন ফোনে কথা অথবা গান শোনা বার বার হতে পারবে কিন্তু জীবন তো কেবল একবার।

রেললাইনে কখনোই হাঁটবেন না

পূর্ব রেলওয়ে

সতর্ক থাকুন — সুরক্ষিত থাকুন

ঝিনুকের ভিতরে মুক্তো

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুকাল সময় নিয়ে ব্যস্ত লোফালুফির পর সেপ্টেম্বরের এক ধূসর সন্ধেয় আমি শৈশব কুড়োব বলে ঈশ্বরীপুরে পৌঁছলাম। বাস থেকে নেমে অনেকখানি হাঁটাপথ। সেই শৈশবে হু হু করে হেঁটে কত পার হয়েছি সবুজে-সবুজে ছাওয়া মেটে পথ, কিন্তু চার দশক কলকাতার জলহাওয়া খেয়ে দরকচা মেরে গেছি, ভাবছিলাম একটা রিকশ পেলে বর্তে যাই, কিন্তু যাকেই জিজ্ঞাসা করি শুনি এখানে কেউ সাইকেল রিকশ চড়ে না, যা আছে তা ভ্যানরিকশ, পা ঝুলিয়ে বসে যেতে হয় যা আমার একেবারেই না-পছন্দ। অগত্যা হেঁটে।

দু-পাশের সবুজ চিরে এগোতে থাকি কবেকার ফেলে যাওয়া ভদ্রাসনের দিকে। বাড়িটা আছে এখনও যদিও বাসিন্দা আমার আত্মীয়জন। ঘরে ফেরার সর্বদাই একটা উত্তেজনা থাকে, আমার আরও বেশি হয়তো, বিশেষ এতকাল পরে বলেই হয়তো রক্তের পারদ এত ঊর্ধ্বগামী। ক্রমে পার হয়ে যাই দু-পাশের গাছগাছালির ল্যান্ডস্কেপ, কোথাও ঘন বাঁশবন, কোথাও বিশাল শিমুলের সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁসি করে সমবয়স্ক মাদার, কোথাও একলা-একা নিম, কোথাও রাস্তার ধার ঘেঁসে নিঃসঙ্গ বকফুলের গাছ, কোথাও এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে সারসার খেজুর ও তাল, কোথাও মস্ত আকারের একটা গাবগাছ। এমন সব মহীরুহর নীচে, পাদপূরণের মতো কত আৎশট্টির বন, কত জংলাঘাস। কোথাও কাশের জঙ্গল, তাতে এই শরতের সোনার আলোয় ঝকমক করছে সাদা কাশফুল। রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে কয়েকটা বেতস দাঁড়িয়ে আছে তালপাতার সেপাইয়ের মতো।

এত সব গাছের অনেকেই অচেনা আমার। কোনও-কোনওটা আবার চেনাও, একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এত বছর, হয়তো আমার ফেরার অপেক্ষায় আছে ওরা সবাই। নিমগাছটা তো আমাকে দেখে ঝিরঝির করে নাড়িয়ে দিল পাতাগুলো। মনে পড়ে এটা শুধু নিম নয়, মহানিম। আজও তেমনই ঝাঁকড়া, ধারালো চেহারার। হলুদ নিমফল কুড়োনো ছিল আমাদের অহেতুক সময়-কাটানোর সময়। খেজুর- তালেরা সংখ্যায় বেড়েছে, তবু পুরনোগুলো তাকিয়ে আছে চেনাচোখে। এমনকী কচি চেহারার বেতসও যেন দাঁড়িয়ে আছে টানা চল্লিশ বছর। হাঁটার সময় মনে পড়ছিল কয়েকদিন আগে বাল্যবন্ধু সুররঞ্জনের ফোন-আলাপের কথা, তুই ঈশ্বরীপুরকে ঠিক যেখানে ফেলে গিয়েছিলি সেখানেই আছে এখনও। ওয়াজেদ আলির সেই বিখ্যাত উক্তির মতো, তার কোথাও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম এর মধ্যে কত ঘাস কত বেতস কত কাশবনের জন্ম হয়েছে, মৃত্যুও, কিন্তু চারপাশের দৃশ্যাবলি দেখে বোঝার উপায় নেই ইতিমধ্যে কত ঘাস-কাশ-বেতসেরা পূর্বসূরিদের শূন্যস্থান পূরণ করে বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে সেই পুরনো ল্যান্ডস্কেপ।

ওরা হয়তো জানে আজও ঈশ্বরীপুর থেকে আমার বুকে ফাগুন চলে আসে কলকাতায়, আমার বারান্দায় খেলা করে চৈত্রদিনের কৃষ্ণচুড়া। আজও মেঘ-ভাঙা চাঁদ এসে ডেকে নিয়ে যায় আলতো ছোঁয়ায়। আজও ভোরে আমার বিছানায় চুপিচুপি উঁকি দেয় ডিমকুসুমের আলো।

দু-পাশে আমার শৈশব কুড়োবার মুহূর্তে মাপছিলাম কী ছিল কী আছে কী নেই! মেটে রাস্তাটা কিছুকাল আগে পিচ হয়েছিল, কিন্তু এখন সেই পিচ উঠে হাড়-জিরজিরে চেহারা। তবু বর্ষায় আর হাঁটুসের কাদা ঠেলে এগোতে হয় না এটুকু কম নয়। রাস্তার পরিসর সেই আগের মতো, রোগা, শীর্ণাকার। দু'টো অ্যাম্বাসাডার মুখোমুখি হলেই নির্ঘাত জ্যাম, কিন্তু বাস্তব হলো এ-রাস্তায় অ্যাম্বাসাডার ঢোকে কালেভদ্রে। যে-গাঁয়ে সাইকেল রিকশই নেই, সেখানে বড়ো গাড়ি আকাশকুসুম। রাস্তার মাঝখান দিয়ে আগেও হেঁটে যাওয়া যেত নির্ভয়ে, এখনও। মাঝেমধ্যে দু-পাশে বাঁশঝাড়গুলো এমনই ঝুঁকে থাকে পথের উপর যেন সেঁধিয়ে যাচ্ছি একটা গুহার মধ্যে। হাঁটাপথে প্রথমে সেই বিখ্যাত মনসাতলা, বছরে ঘটা করে একদিন পুজো হোত, বাকি বছর তার পাশ দিয়ে আসা-যাওয়ার সময় ডানহাত সামান্য তুলে পেন্নামের ভঙ্গি করা। এখন দেখি সেই মনসাতলাটি সেখানেই আছে, শুধু অক্টোপাস-চেহারার ফণীমনসাগাছটি নেই। ইস্, কী নধর ছিল ফণীমনসাগাছটা, দাঁড়া বাড়িয়ে লক লক করত তার ঘন সবুজ কাণ্ডগুলো। কাণ্ডই তো, ফণীমনসার পাতা বলতে তার কাঁটাগুলো। কাঁটার জন্যই আমরা কখনও ফণীমনসাগাছ ছুঁয়েও দেখিনি কেন না সবাই বলাবলি করত ফণীমনসার কাঁটা হাতে ফুটলে এমন ঘা হয় যা জীবনে সারে না। ফণীমনসা না-থাকলে কী হবে, তার অদূরে জলপাইগাছটি বর্তমান। বর্তমান, কিন্তু তার চেহারাটা আশ্চর্য বুড়োটে। ফণীমনসাগাছটা নেই দেখে যেমন বিষণ্ণ হই, তেমনি মন-খারাপ জলপাইগাছের বুড়ো হয়ে যাওয়া দেখেও। চল্লিশ বছর পরে সেই গাছ তেমনই থাকবে তা ভাবাটা অযৌক্তিক। কিন্তু তার ডালে জলপাই

ধরলে ঢিলিয়ে পাড়তাম গোছা-গোছা জলপাই। নুন দিয়ে জলপাই-জারানো খাওয়ার স্বাদই আলাদা। আর একটু এগোতেই বিশাল শিরীষগাছটা। শিরীষের তো বয়সের গাছপাথর থাকে না, সাতপুরুষ ধরে হাত-পা ছড়াতে থাকে ক্রমাগত। শিরীষের সেরকমই পেল্লাই বপু। একমাত্র শিকড় আলগা হয়ে ঝড়ে মুখ থুবড়ে পড়া ছাড়া শিরীষ বুড়ো হয়ে মরে গেছে তা বোধহয় কেউ কখনও দেখেনি বা শোনেনি। শিরীষটার গোড়ার কাছে এসে দাঁড়াই, তাকে দেখে হাসি এক ঝলক। কী জানি শিরীষটা আমাকে চিনতে পারল কি না। স্কুলে যাওয়ার পথে কতবার দাঁড়িয়েছি, কত দুপুরে জিরেন নিয়েছি তার ছায়ায় তা কোথাও লেখাজোখা নেই। এতকাল পরে আমার শরীরে বয়সের রেখা, ছোট্ট আমি এখন বহু বক্ররেখা পেরিয়ে বয়সক্লান্ত, সেই শিরীষ আমাকে চিনবে আশা করা যায় না। তার পাশে একটা অদ্ভুত কনট্যুরের পুকুর, পুকুরটা প্রায় সেরকমই আছে, এঁদো চেহারা, কাল্‌চে জলের উপরে সবুজ গুঁড়োশেওলায় ভর্তি।

শিরীষের গাঁট ছাড়িয়ে ঘরে ফেরার পথে প্রথমে একটা জেলেপাড়া, তারপর কিছু প্রকৃতি ছুঁয়ে বামুনপাড়া, তারপর আবার প্রকৃতি পার হয়ে একটা জেলেপাড়া, আবার প্রকৃতি, আবার বামুনপাড়া। জেলেপাড়ায় বেশিরভাগ বাড়িই ছিল মাটির, মেঝে ও দেওয়ালে মাটি, চালে খড় গোঁজা। বামুনপাড়ার কিছু বাড়ি ছিল পাকা, একতলাই বেশি, দু-চারটে কেবল দোতলা। তিনতলা বাড়ি মোটে একটা। আগে দৈনন্দিন চলার পথে কে কোন বাড়িতে থাকত মুখস্ত ছিল। অনেক বাড়ির ছেলেমেয়ে ছিল হয় আমার সহপাঠী নয়তো এক-দু ক্লাস উপরে বা নীচে। তাদের বাবা-জ্যাঠা-কাকারা আমাকে সবাই না-চিনলেও আমি তাদের চিনতাম ঢের-ঢের।

এতদিন পরে দেখি সবুজের চেহারা তেমন না-বদলালেও অনেক জেলেবাড়িই পাকা, একতলা। কোনো বাড়ির ছাদে টিন বা অ্যাজবেস্টস। টালিও কারও কারও। বামুনপাড়ায় কিছু নতুন পাকা বাড়ি। হাঁটতে হাঁটতে দু-পাশে তাকাচ্ছি আর পরিবর্তনটা বোঝার চেষ্টা করছি ক্রমাগত। যতটা আশা করেছিলাম তেমন বাড়বাড়ন্ত দেখছি না।

কী আশ্চর্য, কলকাতা গত চল্লিশ বছরে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছেছে, আর ঈশ্বরীপুরের ল্যান্ডস্কেপ পড়ে আছে সেখানেই! জেলেপাড়া পেরিয়ে বামুনপাড়ায় ঢোকার মুখে একটা ডেওয়াফলের গাছ। ডেওয়াফল সেসময় ভারী প্রিয় ছিল আমাদের। স্কুলে যাওয়ার পথে কেউ যদি একটা পাকা টুসটুসে ডেওয়াফল পেল তো সে সেদিনকার রাজা। টক-টক মিষ্টি-মিষ্টি হলুদ শাঁস জিবে নিলে শিরশির করে উঠত শরীর। টকে যেত দাঁত, তবু পরের কামড়ের জন্য রোমাঞ্চিত হয়ে অপেক্ষা করত টোকো দাঁত। কখনও যাওয়ার পথে একটা পাকা ডেওয়া কারও চোখে পড়লে ঢিলোতে শুরু করত অবিশ্রান্ত যতক্ষণ না বোঁটা খসে ডেওয়াটা নীচে পড়বে। ডেওয়াটার নিস্তার নেই। একজন ঢিলোচ্ছে দেখলে অন্যরাও শুরু করল ঢিল ছোঁড়া। যার ঢিলে পড়বে ডেওয়াটা তার।

ডেওয়াগাছটার নীচে এসে এমন দু-দণ্ড স্মৃতিকাতর হওয়া, পরুণে পা বাড়িয়ে বামুনপাড়ায়। এখানে একটা বকুলগাছ ছিল। জৈষ্ঠে মর্নিং স্কুলে যাওয়ার পথে যার নীচে বকুল কুড়োনো ছিল আমাদের সমবেত উল্লাস। বাঁয়ে কালীতলাটা সেরকমই আছে, কালীতলা বলতে একটা বিশাল অশত্থগাছ, তার নীচে একটা মাটির আয়তাকার ঢিবি, সেই ঢিবিতে আগের মতো আজও সিঁদুরের ফোঁটার ভিড়। সিঁদুরে-সিঁদুরে উঁচু হয়ে থাকতে ঢিবিটার শিয়র, কী আশ্চর্য এখনও তাই। চল্লিশ বছরে অশত্থগাছটার বয়স কতটা বেড়েছে। কিছুটা শীর্ণকায় লাগছে ঠিকই, কিন্তু অশত্থগাছের বয়স কুড়ি বছরে হয়তো এক বছর বাড়ে। জেলেপাড়ায় ঢুকতে সারসার জাল শুকোতে দেওয়ার সেই পরিচিত দৃশ্যটা না-দেখে বিস্ময় জাগে মনে, চোখে পড়ে একটা মনোহারী দোকান, দোকানটা আগে ছিল না। আগে যে সব জিনিস কিনতে দেড় কিলোমিটার হেদিয়ে ঈশ্বরপুর বাজারে ছুটতে হোত এখন তা ঘরের কাছে। কে দোকানটা করল তা দেখতে দোকানের ভিতর চোখ পাতি। বছর পঁচিশের যুবকটি চেনা না-হওয়াই স্বাভাবিক কেন না আমি যখন ঈশ্বরীপুর ছেড়েছি তখন যুবকটির হয়তো জন্মই হয়নি।

মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করি, এটা তোমাদের দোকান?

যুবক বিভ্রান্ত মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

—তোমার বাবার নাম কী?

—গোপাল চন্দ্র দাস।

—ও, গোপালকাকার দোকান? ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করি, তোমার বাবা মাছ ধরতেন ইছামতীতে?

যুবকটি লাজুক ঘাড়ে, হ্যাঁ।

—এখন ইছামতীতে মাছ ধরে না কেউ?

যুবকটি হাসে, গাঙে জল কোথায় যে মাছ ধরবে!

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে অন্যমনস্ক। গোপালকাকার ছেলে মনিহারী দোকান করে নির্বাহ করছে জীবিকা এটা আমার কাছে চমক। কিংবা হয়তো চমক নয়, এইটেই স্বাভাবিক,

তুমি শক্তি, তুমিই প্রেরণা
তুমি মহামায়া
তোমার করুণায় উদ্বেলিত
কাশফুল আর ধরা
থাকে যদি
ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
DUTA
SPICE POWDER & PAPAD
TURMERIC
DUTA CUMIN
CORIANDER
RED CHILLI
ডাটা গুঁড়ো মশলা কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন

চল্লিশ বছরে কিছু তো বদলাবেই গ্রাম। কিন্তু ওই যে বলল, ইছামতীতে জল নেই সে আবার কী রকম!

—আ রে, শঙ্খ না? এক সাইকেল আরোহী পাশ দিয়ে হু হু করে বয়ে যাওয়ার সময় উচ্চারণ ছড়িয়ে দিলেন বাতাসে। প্যাডেল থামিয়ে দাঁড়ালেন এক ঝলক।

চিনতে না-পেরে নিঃশব্দ থাকি। স্মৃতির কুলুঙ্গিতে হাতড়াই। পাকাচুলো মানুষটাকে চিনতে অপারগ হই।

—চিনতে পারলে না, আমি নয়নকাকা।

—ও, নয়নকাকা, তা আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?

—চেনা কি আর যায়! সে কত বছরের কথা। দীপুই বলল তোমার আজ আসার কথা। তা ভালো খবর তো সব?

সাইকেল বেল বাজিয়ে চলে যেতে এক ঝলক হেসে নিই স্বগত উচ্চারণে। এমন অনেক মুখই চোখে পড়ছে যারা হেঁটে বা সাইকেলে হু হু করে পেরিয়ে যাচ্ছে আমাকে। তাদের কাউকেই আমার চেনার কথা নয়, আমি অবাক হচ্ছি, তারাও। তাদের কৌতূহলী চোখ আমাকে ছুঁয়েই চলে যাচ্ছে পরবর্তী আকর্ষণের দিকে। গ্রামে নতুন কেউ এলে অনেকেই উঁকিঝুঁকি মারে, জানলা খুলে মেয়েবৌরাও দেখে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন চেনা মানুষ চোখে না-পড়ায় একটু যে দমে যাচ্ছি না তা নয়। এতকাল পরে দেশঘরে ফিরে এসেছি কিছু পুরোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার লোভেই। যদি সেই শৈশব কুড়োতে পারি, স্বাদ নিতে পারি সেই নরম ও লাজুক সময়ের যদি নিঃশ্বাসে ভরে নিতে পারি সেই সবুজ হাওয়া, যদি ছুঁয়ে ফেলতে পারি সেই রূপকথার দিনগুলো।

আর একজন পাকাচুলো মানুষকে হনহন পায়ে হেঁটে আসতে দেখে উথলে উঠি সহসা যদি আমার চেনা পরিচিতজন কেউ হন এই ভেবে, কিন্তু কাছে আসতে হতাশ, না, ইনি চেনা কেউ নন। পরুণে এও ভাবি ইতিমধ্যে বহু নতুন মানুষ এসে থাকতে পারেন গ্রামে, বসবাস শুরু করেছেন নতুন বাড়িঘরদোর করে, তাঁর কাছে আমি অচেনা, তিনিও আমার কাছে।

হাঁটতে হাঁটতে ইছামতীর পাশে। দূর থেকে যেটুকু ইছামতী গোচরে তা অবাক করে। ইছামতী গায়েগতরে তেমন ভারী ছিল না কোনোদিন, কিন্তু এখন আরও একটু শীর্ণকায়। ইছামতীর সঙ্গে আমার নিদারুণ ভাব-ভালোবাসা ছিল শৈশবে, ইছামতীর কিনারে বসে থাকতাম পা ঝুলিয়ে, জোয়ার থাকলে পায়ের চেটো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত ইছামতীর জল। সেই স্পর্শে রক্তেও বয়ে যেত এক শীতল জোয়ার। কখনও স্কুলে যাওয়ার আগে স্নানে গিয়ে সাঁতরে পার হয়ে যেতাম ইছামতীকে। কখনও স্কুল থেকে ফিরে বসে থাকতাম খেয়াঘাটে। খেয়ানৌকোর পারাপার দেখতাম অনন্ত কৌতূহলে। কত মানুষ ওপার থেকে আসে, কেউ পায়ে হেঁটে কেউ সাইকেলে। তাদের হাতে বা মাথায় বা সাইকেলের কেরিয়ারে নানান বোঝা। হাটের দিনে উপচে পড়ত নৌকোর মস্ত পাটাতন। খেয়ার মাঝির হাত টনটন করে উঠত হাল বাইতে বাইতে।

ইছামতীকে পরে আরও ভালো করে দেখব এই ভেবে ঘরে ফেরার পথে এগোই। বাঁয়ে বাঁক নেওয়ার মুখেই পঞ্চবটি। কী আশ্চর্য পঞ্চবটির থান কিন্তু একইরকম। পঞ্চবটিতে পাঁচ রকম গাছ আছে কি না তা আবিষ্কারে বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু অশ্বত্থ, বেল, খেজুর আর একটা শিমুল ছাড়া দেখতে পাইনি কখনও। পঞ্চম গাছটি কী গাছ তা এক-একজনে এক-একরকম বলত, কিন্তু আদত গাছটি নাকি ভিতরে কোথাও রয়েছে জড়িয়েমড়িয়ে।

বাড়িতে আগেভাগেই খবর দেওয়া ছিল, তাই নির্দিষ্ট ঘরটি ঝাড়পোঁছ করে রেখেছে দীপু। আমি কিছুক্ষণ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকি নিঃশব্দ। যে-বাড়িতে চোদ্দ-পনেরোটা নিবিড় বছর কাটিয়েছি তার উপর যে একটা ভীষণ মমত্ব থাকবেই তা মানতে বাধা কোথায়। কিন্তু বাড়িটি আর সেই বাড়ি নেই, পরিচর্যার অভাবে জরাজীর্ণ। এরকম যে-দশা তা আগেই জানা ছিল, মাঝেমধ্যে চিঠি যেত, বাড়িটা আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। মেরামতি করতে এত টাকা লাগবে যে—

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছি বাড়িটির ভগ্নদশা। ইঁটের ভিত, তিনটে ঘরের দু'টোর মেঝে পাকা করা গেলেও একটি ঘর আর দাওয়া ছিল মাটির। সেই মাটির দাওয়ায় চাটাই বিছিয়ে ভোর থেকেই পড়া চলত আমাদের। কত-কত সকাল, কত-কত সন্ধে কেটে গেছে এই দাওয়ায়। ভগ্নস্তূপ হলেও বাড়িটি আমার ধুলোয়-ধুলোয় চেনা। কিন্তু আমার সেই ভদ্রাসন যে আমাকে চিনতে পারছে না তাতে আমি নিঃসন্দেহ। ঘরগুলোও এতদিনে প্রত্নতত্ত্বের বিষয়। এই ঘরেই তো কেটে গেছে কত-কত দিন আর রাত। অথচ এত বছর পরে মনে হচ্ছে এই বাড়ি, ঘর, এই দাওয়া কোনো কিছুরই উপর আমার আর অধিকার নেই।

কিছুক্ষণ দাওয়ায় পেতে রাখা চেয়ারে বসে ফিরে যেতে চাই ফেলে আসা দিনগুলোয়। ক্যাসেট রি-ওয়াল্ড করার মতো চাউনি ছুঁড়তে থাকি চৌহদ্দির চারপাশে। চোখ ছুঁয়ে যায় আম-জাম-কাঁঠালের গাছগুলোয়। এর বেশিরভাগই তখনকার পোতা। কিছু

গাছ নতুন। কোনগুলো নতুন তা চিনতে দেরি হয় না। কিন্তু মস্ত কালোজাম গাছটা যথাস্থানে নেই দেখে মন-খারাপ। কালোজাম গাছটায় ছিল আমাদের দৌরাত্ম্য। এক লাফে নীচের ডালটা ধরে ফেলতে পারলেই রিঙে ঝোলার মতো এক-ঝাঁকুনিতে পা দিয়ে অন্য একটা ডাল ধরে উঠে পড়তাম ভল্ট দিয়ে। কাণ্ড বেয়ে বেয়ে উঠতাম উপরের ডালটায়। তারপর তরতর করে বেয়ে একেবারে মগডালে। গাছে জাম থাকলে তো নামার সময় জিবে ঘন কফিন রং। না-থাকলেও শুধু গাছে-চড়ার মজায় উপরে উঠে বসে থাকা, অনেক উপর থেকে পৃথিবীটা কেমন দেখায় তার একটা অভিজ্ঞতা অর্জন।

কালোজাম গাছটার শূন্যতা কিছুক্ষণ অনুভব করি, তাকাই আশেপাশের ল্যান্ডস্কেপে, দেখি এরকম আরও কিছু শূন্যতা। সব শূন্যতাই যে শূন্য আছে তা নয়, খুদে জাম গাছটার জায়গায় কয়েক ঝাড় কলাগাছ। বেশ নধর চেহারার কলাগাছ দেখে কিছুক্ষণ বিষণ্ণতায় সবুজ পোঁচ। বিশাল তেঁতুলগাছটাও অদৃশ্য। কত বয়স হয়েছিল তেঁতুলগাছটার? আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের কম। শৈশবে ঘটা করে তেঁতুলগাছ রোপণের দৃশ্য এখনও ভুলিনি। ডালে তেঁতুল ধরলে কাঁচা তেঁতুলের স্বাদে দাঁত ও জিবের বারোটা বেজেছে বহু বহু দিন। ঠাকুমা চেঁচাতেন, 'খাসনে ওরে খাসনে। কাঁচা তেঁতুল খেলে জ্বর হবে নিঘ্‌ঘাত।' জ্বর হয়েছিল কি হয়নি এখন মনে নেই। সে কারণে তেঁতুল খাওয়ায় কোনো দিন জিরেন না-দেওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

চেয়ার থেকে উঠে এমন অনেক কৌতূহলের চরিতার্থ করার চেষ্টা করি। দেখতে পাই দূরের খেজুরগাছের বিশাল মাঠটা। এক লপ্তে অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটা খেজুরগাছের সহাবস্থান। শীত পড়লেই গাছ কাটাতে আসত রহমানদা। হাতে (পুলি ফলার কাস্তে, কোমরে বাঁধা থাকত একটা মোটা কাছি, খেজুরকাণ্ডের সঙ্গে কাছি দিয়ে নিজেকে বেঁধে রহমানদা উঠে পড়ত খেজুর গাছের ডগায়। নিখুঁত করে কাটত পাশাপাশি দুটো চোখ। দুটো চোখের ঠিক মধ্যিখানে একটা নল বসিয়ে দিলেই নল বেয়ে নেমে আসত মিষ্টি রস। তখন নলের মুখে পেতে দিত ভাঁড়। সারা সন্ধে সারা রাত রস নেমে আসত ফোঁটায়-ফোঁটায়। ভোরে সেই ভাঁড় নামিয়ে দেখত টায়ে-টায়ে ভরে আছে ভাঁড়।

সেই খেজুর গাছের দৃশ্যের দিকে কিছুক্ষণ চোখ পাতি। প্রায় একই রকম রয়ে গেছে মাঠটা। কোনো কোনো খেজুরগাছ অদৃশ্য, তার জায়গায় কত-কত কচি খেজুরগাছ। এখনও বছর বছর গাছগুলো যে কাটা হয় তার সাক্ষী সেই চোখগুলো। খেজুরগাছ কাটার নিয়ম হলো এ বছর যেদিকে গাছ কাটা হবে পরের বছর তার ঠিক উল্টোদিকে। যে কোনও খেজুরগাছের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে এই দৃশ্য। প্রতি গাছের দুই বিপরীত দিকের চোখে পা রেখে খেজুর গাছে ওঠা দারুণ আরামের। সেই আরামে ভর করে কতদিন খেজুর গাছের মাথায় উঠে কত যে রস চুরি করে খেয়েছি তার ঠিক নেই। রাত এগারোটা নাগাদ দল বেঁধে হানা দিতাম মাঠটায়। সতর্ক থাকতে হোত কখন রহমানদা হাঁক্কাড় পাড়ে, 'কেডা রস খায়?' তখন ঝুপঝাপ লাফিয়ে নেমে দে দৌড় দে দৌড়। কখনও ধরা পড়িনি অবশ্য। রহমানদা ধরতে চাইতও না কেন না গোটা মাঠে এতগুলো ভাঁড় পাতা থাকত সেই তুলনায় কচিকাঁচাগুলো কতটাই-বা রস খেতে পারে, আর যদি খায়ও তো রাত এগারোটার পর থেকে ভোর পর্যন্ত যে-রস জমা হবে তাতেই ভাঁড় ভর্তি। দীপুকে জিজ্ঞাসা করি, রহমানদাই এখনও গাছ কাটে?

দীপু হাসে, রহমানদা আবার কে? গাছ কাটে জলিল।

আমার সংবিৎ ফেরে। তখনই রহমানদার চুল ছিল পাকা, অনেকটা পাটের ফেঁসোর রং। সে কবেই নিশ্চয় দেহ রেখেছে। হয়তো তার ছেলে, ভাই বা ভাইপো কিংবা পরিবারের অন্য কেউ গাছ কাটে এখন। দীপুর যা বয়স তাতে রহমান নামের কাউকে চেনার কথা নয়।

বাড়ির চৌহদ্দির চারপাশে ঘোরাঘুরি করছি, আর একটু একটু করে কুড়োচ্ছি মুক্তোর মতো ঝিনুকের ভাঁজে রেখে যাওয়া আমার শৈশব। বিকেলে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। তখন ঘোর দুপুরে সুনসান ছিল পথ, এখন নিশ্চয় পথঘাট লোকে লোকাকার। ইছামতীর খেয়াঘাট তো ভিড়ভর্তি হবেই। কাল যাওয়া যাবে সুররঞ্জনের কাছে।

সন্ধ্যেয় হাঁটতে যাই ইছামতীর কিনারে। খেয়াঘাটে দু-দণ্ড বসে থাকলে হয়তো চেনাজানা হবে বহু মানুষের সঙ্গে। বাড়ির সামনে খানিকটা ফাঁকা মাঠ, মাঠের ওপারে ইছামতী। দূর থেকে দেখছি ইছামতীর তীরের সেই কোলাহলটা নেই। হাটবারে উপচে পড়ত ভিড়, ভিড়াক্রান্ত থাকত গভীর রাত পর্যন্ত। আজ হাটবার নয়, নেই তাই ভিড়ও। তবু সামনের রাস্তা দিয়ে মানুষজন চলাচলের দৃশ্য দেখা যেতই। সেই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলাম মাঠ থেকে। খেয়ার মাঝি তারিণীদা কি এখনও বেঁচে আছে! আমার চেয়ে বছর দশেকের বড়ো ছিল, থাকার কথাই। পায়ে পায়ে ইছামতীর কিনারে পৌঁছে কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের চোখে

তাকিয়ে। খেয়াঘাটের চিহ্নটি পর্যন্ত নেই। ইছামতী শীর্ণ হতে হতে প্রায় মজে এসেছে। সরু খালের মতো বয়ে যাওয়া ইছামতীর উপরে একটা কাঠের সরু ব্রিজ। একটা রিকশ কোনওক্রমে পার হতে পারে সেই সেতুর উপর দিয়ে। ইছামতীর কিনারে যেখানটায় পা ঝুলিয়ে বসতাম সেখানে এখন মস্ত চর।

বুকের ভিতরে জমিয়ে রাখা একটা দীর্ঘশ্বাস এতক্ষণে মুক্তি পেয়ে রিং পাকিয়ে ছড়িয়ে যায় হাওয়ায়। শঙ্খ নামের আমিটার মনে হয় সে তো জানত না হাজার বকুল পায়ে-পায়ে গেছে পিঁষে, বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যের ছাঁটে ভিজেছে বকুলতলা।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সেই দৃশ্যের দিকে তাকাই। আঁধার হয়ে এসেছে একটু-একটু। মাথার উপরে দেখি এক ফালি চাঁদ। তৃতীয়া না চতুর্থী, কী তিথি আজ! চাঁদের ফালি থেকে একটু-একটু আলো ছড়াতে শুরু করেছে। যত রাত হবে ঝিরঝির করতে থাকবে আলোর ছটা। চাঁদের সেই মরা আলোয় দেখতে থাকি ইছামতীর কঙ্কাল। তিরতির করে জল যাচ্ছে সরু রেখায়। তাতে অল্প-অল্প চাঁদের আলো পড়ে মৃদু ঝিকমিক। ছেলেবেলায় ভূতেরা এমনই দাঁড়িয়ে থাকত ঈশ্বরীপুরের আনাচে কানাচে। আমরা ইছামতীর কিনারে পা ঝুলিয়ে বসে চাঁদের আলোয় সেই ভূতদের গল্প বলে ভয় দূর করতে চাইতাম। আজ ইছামতী নিজেই একটা কঙ্কালের বেশ ধরে ভয় দেখাতে চাইছে আমাকে।

আমার শরীর শিরশির করতে থাকে ছেলেবেলার মতো। এক অভিনব মন-খারাপ ঘিরে ধরে আমার চৈতন্য। টুপটাপ বকুল কুড়োনোর মতো শৈশব কুড়োচ্ছিলাম। তাতে দু-একটা পিঁপড়েও কুড়িয়েছি এতক্ষণ। হঠাৎ একটা আস্ত কঙ্কাল হাত উঠে আসতে আমার ভিতরে ভয়। সুররঞ্জন এই গ্রামে সেই একই ভাবে রয়ে গেছে বলে, মাস্টারি করে দিন কাটাচ্ছে বলে সে বুঝতে পারেনি ঈশ্বরীপুর কখন যেন লুট হয়ে গেছে সবার অজান্তে।

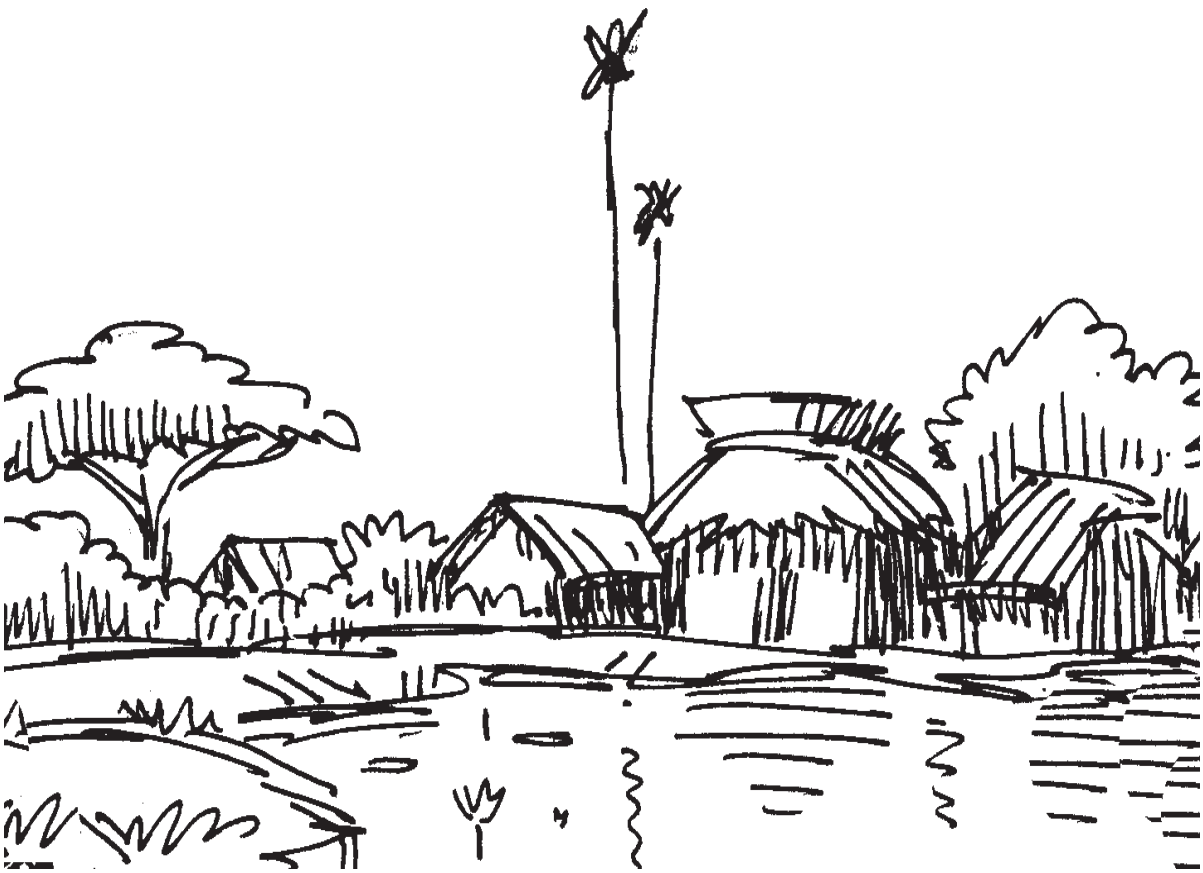

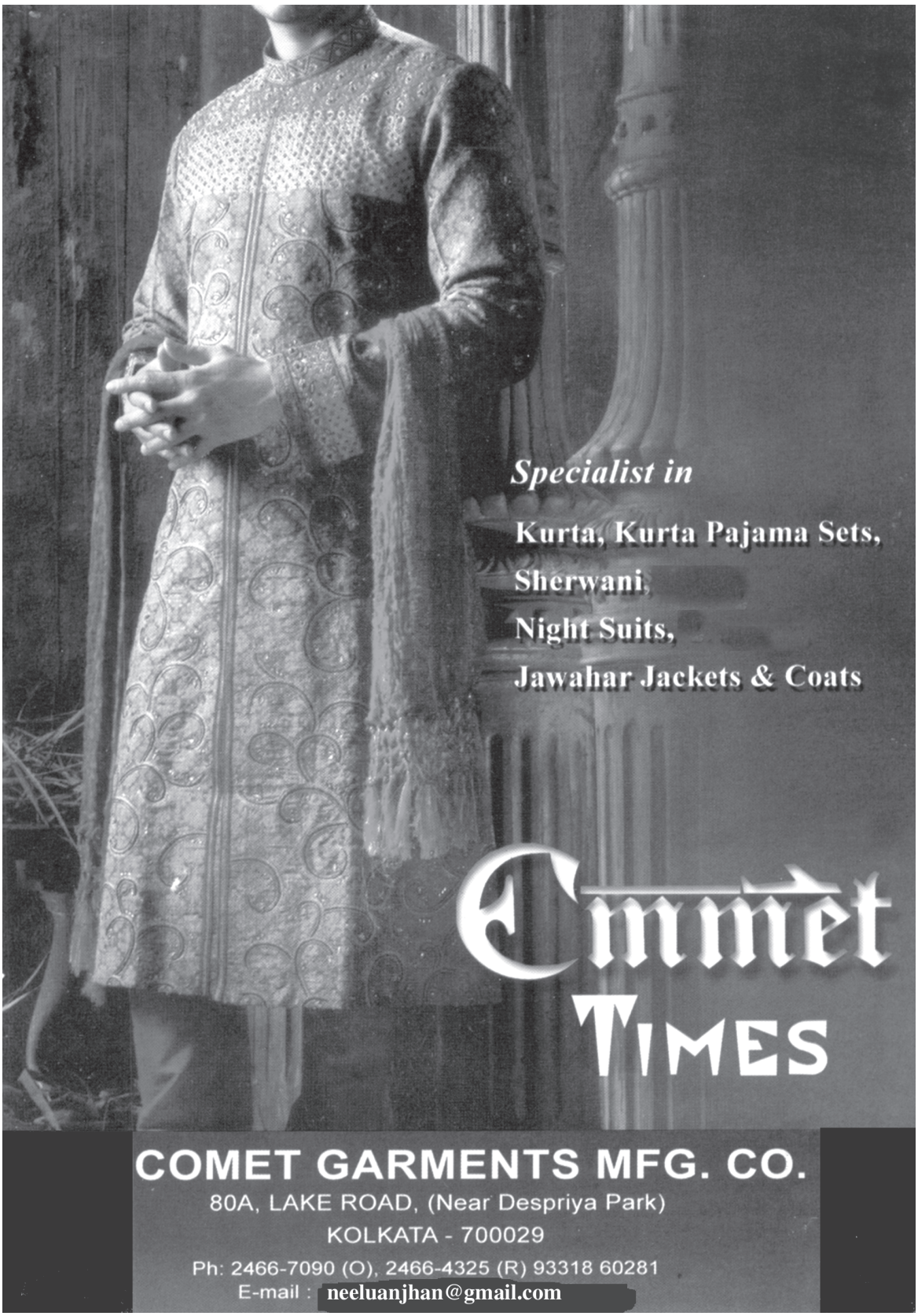
Specialist in
Kurta, Kurta Pajama Sets,
Sherwani,
Night Suits,
Jawahar Jackets & Coats
Comet
TIMES
COMET GARMENTS MFG. CO.
80A, LAKE ROAD, (Near Despriya Park)
KOLKATA - 700029
Ph: 2466-7090 (O), 2466-4325 (R) 93318 60281
E-mail : neeluanjhan@gmail.com

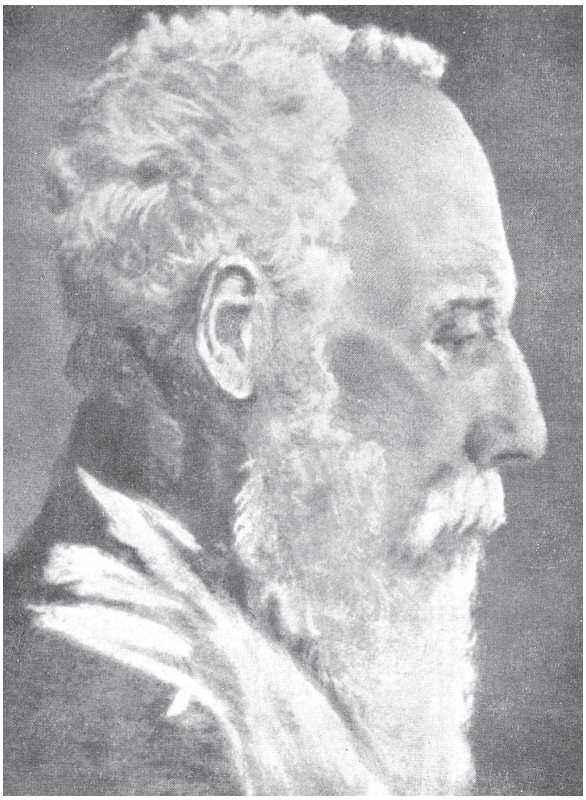

হিন্দুত্বের রক্ষক দেবেন্দ্রনাথ

রবিরঞ্জন সেন

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ঊনবিংশ শতাব্দীর উপনিবেশকালীন ভারতবর্ষের নবজাগরণের এক অন্যতম মনীষীরূপে আমাদের কাছে সুপরিচিত। তাঁকে রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেবরূপে আমরা চিনি, ব্রাহ্মসমাজের সেই যুগের অবিসংবাদিত নেতারূপেও আমরা চিনি। কিন্তু এই দু'টি চেনা পরিচয়ের আড়ালে স্বদেশ, স্বধর্ম ও স্বাদেশিকতার রক্ষায় সংগ্রামী নেতা, হিন্দুত্বের নিষ্ঠাবান রক্ষক দেবেন্দ্রনাথ বর্তমান বাঙালি সমাজের চেতনায় অনেকাংশেই বিস্মৃত হয়েছেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির তৎকালীন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ও জমিদার দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ অল্প বয়সে বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ একদিন তাঁর সামনে উড়ে আসা একটি গ্রন্থের পাতা তাঁর জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়। এই পাতায় মুদ্রিত ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক পড়ে তার অর্থ জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে গেলেন। পরবর্তী ঘটনাগুলি সর্বজনবিদিত, ১৮৪৩ সালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট তিনি ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষা গ্রহণ করেন। মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে 'উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম' বা 'বেদান্তপ্রতিপাদিত সত্য ধর্মে'র প্রচার ও উপনিষদে বর্ণিত এক অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের সাধনাকেই তাঁর জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করলেন।

সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে সাধনা ও তপস্যার যে নিরবচ্ছিন্ন ধারা এই ভারতের মাটিকে সাধনক্ষেত্রে পরিণত করেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই পরম্পরারই এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। যদি অপর কোনো কৃতিত্ব নাও থাকত, উচ্চস্তরের সাধকরূপেই এই দেশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করতে পারতেন। তবে তাঁর ধর্মজীবন ও সাধনা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। বরং সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের দাপটে যখন দেশীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্ম বিদেশী প্রভাবের প্লাবনে মুছে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন সেই আত্মরক্ষার লড়াইয়ে দেবেন্দ্রনাথের অগ্রণী ভূমিকা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ইংরেজরা মহীশূর ও মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। এই সময়কালে তারা অত্যন্ত সাবধানী নীতি অবলম্বন করেছিল এবং ভারতের ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি শিক্ষা প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থাগুলিতে

হস্তক্ষেপ করার প্রচেষ্টা করেনি। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠা শক্তিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার পরই এদেশে বৃটিশরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয় ও ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে চিরতরে পরিবর্তন করার জন্য উদ্যমী হয়। যুদ্ধের পূর্বেই ১৮১৩ সালের সনদ দ্বারা ভারতে খৃস্টীয় মিশনারীদের অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। ১৮৩৫ সালের কুখ্যাত 'মেকলে মিনিট'-এর মাধ্যমে ভারতবাসীকে নিজের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে অবশেষে ধর্মান্তরিত করে বৃটিশ শাসনের অনুগত ভৃত্য তৈরি করার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৮৪০-এর দশকের মধ্যেই শাসকদের এই নীতির পরিণাম বাঙালি সমাজের মধ্যে দেখা দিতে শুরু করে।

ভারতবর্ষকে খৃস্টান করার উদ্দেশ্যে ১৮৩০ সালে স্কটল্যান্ডে General Assemblies Mission-এর পক্ষ থেকে আকেলজান্ডার ডাফকে কলকাতায় প্রেরণ করে। ডাফ্ সাহেব কলকাতায় এসে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে বাইবেল পড়ানো শুরু হয় এবং তিনি 'India and India's Mission' নামক একটি পুস্তক রচনা করেন যেখানে হিন্দুধর্ম ও বেদান্তকে তীব্র আক্রমণ করেন। তাঁর এই আক্রমণে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মাধ্যমে এর প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। ১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে ১৮৪৫ পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় চারটি প্রবন্ধের মাধ্যমে ডাফের এই পুস্তকে এবং তার সঙ্গে কলকাতার তৎকালীন খৃস্টান পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত সমস্ত কুৎসার জবাব ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৪৫ সালে এই চারটি প্রবন্ধ একত্রিত করে 'Vedantic Doctrines Vindicated' নামক একটি পুস্তক তিনি প্রকাশিত করেন।

এই তীব্র বাদানুবাদের মধ্যেই কলকাতার সম্ভ্রান্ত বাঙালি সমাজকে আলোড়িত ও শঙ্কিত করার মতো একটি ঘটনা ঘটে। ১৮৪৫ সালের এপ্রিলে ডাফ সাহেব তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্র ১৪ বছর বয়সের উমেশচন্দ্র সরকার ও তার ১১ বছর বয়সের বালিকা স্ত্রীকে অভিভাবকদের সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। আইনত নাবালক হয়ে উমেশচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মপরিবর্তন করতে পারতেন না। কিন্তু তাদের পিতা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করলেও আদালত ধর্মান্তরণের পক্ষেই রায়দান করে।

হিন্দু সমাজের এই অপমানের কথা শুনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্থির থাকতে পারেননি। ঘটনা শোনার পর তাঁর মনের অবস্থা সম্পর্কে তিনি নিজে লিখেছেন, ''ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্যন্ত খৃস্টান হইতে লাগিল। তবে রোস্, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনই শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল।— অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্যন্ত স্বধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না! আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব! ধর্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইল এবং আমাদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব ইহল। ... অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনারীদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ। তাহাদিগের পাঠশালাতে পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও এবং যাহাতে স্ফূর্তির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে, এমত উদ্যোগ শীঘ্র কর। যদি বল, পাদ্রিদিগের পাঠশালা ব্যতীত দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন জন্য অন্য স্থান কোথায়? কিন্তু ইহাই বা কি লজ্জার বিষয়! খৃস্টানরা অতলস্পর্শ সমুদ্রতরঙ্গ তুচ্ছ করতঃ আপনাদিগের ধর্ম প্রচার জন্য ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাঠশালা সকল স্থাপন করিতেছে। আর আমাদিগের, দেশের দরিদ্র সন্তানদিগকে অধ্যাপন করিবার নিমিত্ত একটিও উত্তম পাঠশালা নাই। সকলে একত্র হইলে তাহাদিগের পাঠশালার তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশগুণ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না? ঐক্য থাকিলে কোন কর্ম সিদ্ধ না হয়?' (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী', বিশ্বভারতী, ১৯৬২, পৃঃ ৬২-৬৩)

সমগ্র হিন্দু সমাজ যখন মিশনারীদের ক্রমাগত ধর্মান্তরণের প্রচেষ্টায় প্রচণ্ড বিপদের সম্মুখীন তখন দেবেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করে ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি অনুভব করেছিলেন যে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক প্রতিবাদ যথেষ্ট নয়। যতদিন না হিন্দুদের নিজস্ব উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে ততদিন শিক্ষার নামে পাদ্রীরা তরুণ শিক্ষার্থীদের ধর্মান্তরণের সুযোগ কখনোই পরিত্যাগ করবে না। তাই তিনি এই সঙ্কটের প্রতিরোধের জন্য কীভাবে তৎকালীন হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এক মঞ্চে আনীত করেন তার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন।".... আমি তাহার পরে প্রতিদিন গাড়ি করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত ও মান্য লোকদিরে নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম যে, হিন্দুসন্তানদিগের যাহাতে পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে যাইতে আর না হয়, এবং আমাদের নিজের বিদ্যালয়ে তাহারা পড়িতে পারে তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে।' ('আত্মজীবনী', পৃঃ ৬৪)

তিনি আরও অনুভব করলেন যে, ব্রাহ্ম এবং অব্রাহ্ম অর্থাৎ নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী, তৎকালীন বাঙালি হিন্দু সমাজের এই দুই অংশকে সামাজিক সঙ্কটের মুখে এক মঞ্চে না আনতে পারলে হিন্দুবিরোধী শক্তি অর্থাৎ মিশনারীরা এই বিভেদেরও সুযোগ গ্রহণ করবে। তাই রামমোহন রায়ের সময়কাল থেকে

রাধাকান্দ দেব

বিদ্যমান ব্রাহ্ম এবং অব্রাহ্মণদের মধ্যে বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে উঠে দলাদলির সমাপ্তি ঘটিয়ে ব্রাহ্মসমাজের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মসভার নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব এবং রাজা সত্যচরণ ঘোষালকেও এই মিলিত উদ্যোগে তিনি সামিল করান। অপরদিকে ডিরোজিওপন্থীদের নেতা রামগোপাল ঘোষের কাছেও এই আবেদন নিয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন মত-পথ-সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ সত্ত্বেও হিন্দুবিরোধী শক্তির আক্রমণের প্রতিরোধে সামগ্রিক অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্ত সকলকে যে একসঙ্গে চলতে হবে এই দূরদৃষ্টি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, ''এদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, ওদিকে রামগোপাল ঘোষ; আমি সকলের নিকট গিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলাম। আমার এই উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত হইলেন। ইহাতেই ধর্মসভা ও ব্রাহ্মসভার যে দলাদলি এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য ছিল, সকলি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই একদিকে হইলেন এবং যাহাতে খৃস্টানদিগের বিদ্যালয় আর ছেলে পড়িতে না পায়, যাহাতে খৃস্টানরা আর খৃস্টান করিতে না পারে, তাহার জন্য সম্যক চেষ্টা হইতে লাগিল। (আত্মজীবনী, পৃঃ ৬৪)

দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ২৫ মে ১৮৪৭ সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের একটি মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রায় এক হাজার ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন এবং চল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়। এই আন্দোলনের ফলে 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মসভা ও ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন বিদ্বেষ ভুলে এই মিলিত উদ্যোগকে চিহ্নিত করতে বিদ্যালয়ের সভাপতি এবং সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন যথাক্রমে রাধাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই উদ্যোগের পরিণাম সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন, ''সেই অবধি খৃস্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।''

দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ সভার সদস্য ছিলেন। কলেজের মূল হিন্দু চরিত্র বজায় রাখতে এবং খৃস্টানিকরণের প্রতিরোধ করতে তাঁকে বারবার বৃটিশ প্রভাবিত কাউন্সিল অফ এডুকেশন (শিক্ষা সংসদ) এর সঙ্গে সংঘাতে যেতে হয়। এই শিক্ষা সংসদের সভাপতি ছিলেন জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন।

কলেজের মূল নীতি অনুযায়ী খৃস্ট ধর্মান্তরিত কোনো হিন্দু শিক্ষক বা ছাত্র এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে না। ১৮৪৮-এ কলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু খৃস্টান হলে এই বিষয় নিয়ে অধ্যক্ষ সভা ও শিক্ষা সংসদের মধ্যে বিরোধ হয়। ১৮৪৯ সালে গুরুচরণ সিংহ নামক কলেজের একটি ছাত্র খৃস্টান হলে দেবেন্দ্রনাথ একজন অধ্যক্ষ হিসেবে এর বিরুদ্ধে সক্রিয় হন। গুরুচরণ সিংহকে কলেজ ত্যাগ করতে হয় এবং দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত একটি সার্কুলার জারি করে কলেজের এই নিয়ম সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করেন। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অধ্যক্ষসভার প্রধানতম সদস্য রাজা রাধাকান্ত দেব ও শিক্ষা সংসদের সভাপতি বেথুন সাহেবের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ হয় এবং শেষপর্যন্ত বিরক্ত হয়ে রাধাকান্ত দেব অধ্যক্ষসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

স্বদেশী শিক্ষার পথিকৃৎ দেবেন্দ্রনাথ

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে ১৮৩৫ সালের 'মেকলে মিনিট'-এর পর এদেশে পূর্ণোদ্যমে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা এবং ইউরোপীয় চিন্তাভাবনার কাঠামো অনুসরণকারী শিক্ষা চালু করা হয়। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দেবেন্দ্রনাথ এর পরিণাম সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। শাসকদের এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দেশীয় ভাষা, সাহিত্য ও ধর্মবিষয়ক শিক্ষার অভাব বোধ করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে ১৮৪০ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' নামক একটি জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে তিনি আগ্রহী হন। যোগেশচন্দ্র বাগল এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্বন্ধে লিখছেন, ''ঐ সময়ে খৃস্টান মিশনারীগণ অবৈতনিক ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরাজি শিক্ষায় ভারতবাসীদের আগ্রহের পূর্ণ সুযোগ লইলেন এবং ইংরাজি শিক্ষার ছলে তাহাদের সন্তানদের খৃস্টতত্ত্বই বেশি করিয়া শিখাইতে লাগিলেন। কিন্তু কি সরকারি, কি দেশীয়, কোন শ্রেণীর বিদ্যালয়েই ধর্মশিক্ষার রেওয়াজ ছিল না। এজন্য মিশনারীদের

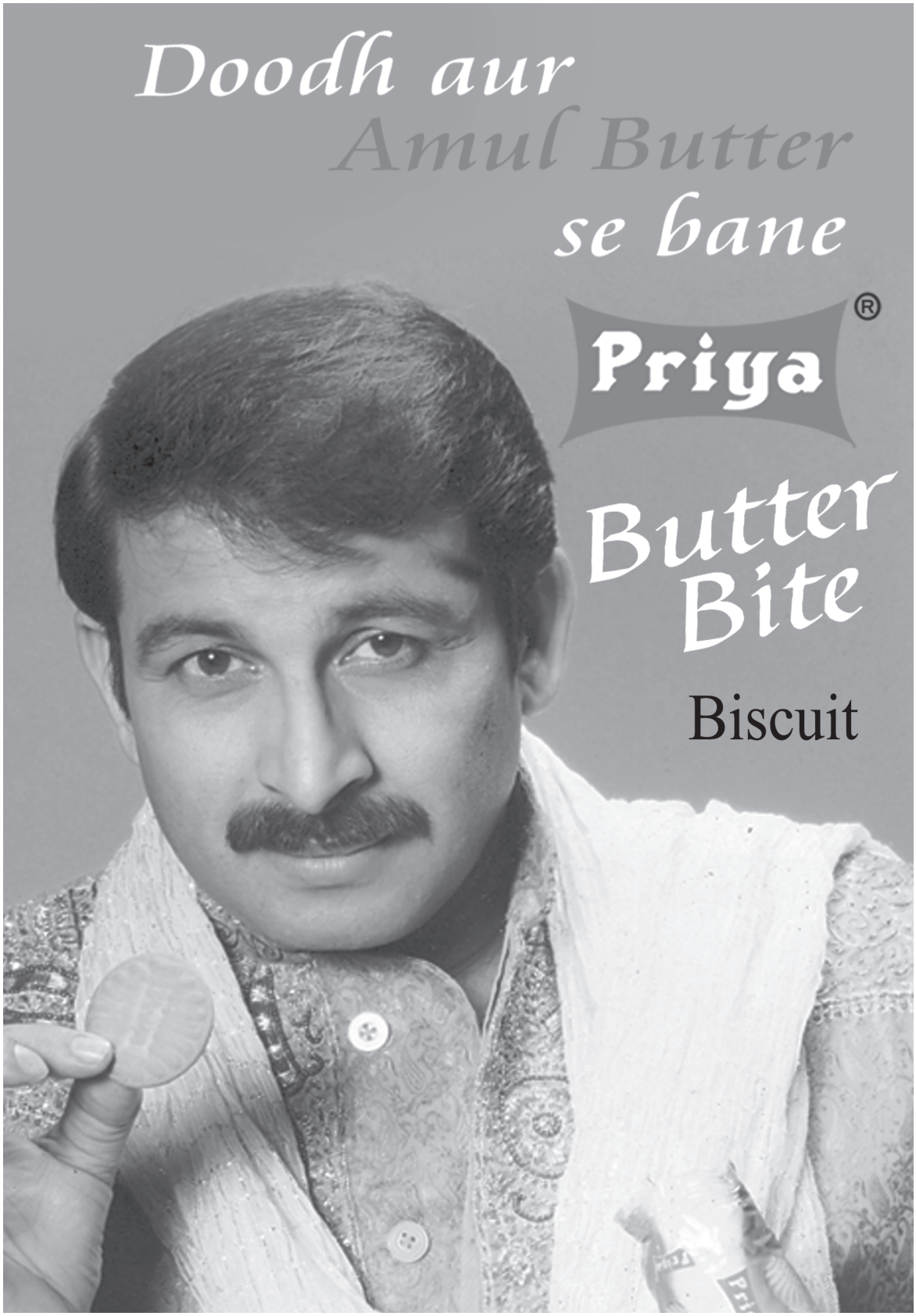
Doodh aur
Amul Butter
se bane
Priya®
Butter
Bite
Biscuit

প্রদত্ত শিক্ষার বিধর্মীভাব প্রতিরোধের কোন উপায়ই রহিল না। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্মের কথা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া একদিকে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি দূর করিতে এবং অন্যদিকে খৃস্টানী শিক্ষার কিয়ৎপরিমাণে গতিরোধ করিতে প্রয়াসী হইলেন।'' ('দেবেন্দ্র ঠাকুর', যোগেশচন্দ্র বাগল)

পাঠশালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তার প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত বলছেন, ''আমরা আর কোন বিষয়ে আপনাদিগের প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি এবং খৃস্টান ধর্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম হয়। অতএব এইক্ষণে আমাদিগের স্ব-স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌণে ইংরেজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবে— তাঁহারদিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাষা হইবেক এবং তাঁহারদিগের ধর্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম হইবেক, সুতরাং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমারদিগের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রের এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখ রবিবার এতৎ পাঠশালা রূপ নবকুমার প্রসব করিলেন। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৬৫ শক, পৃঃ ১১-১২)

''আমরা আর কোন বিষয়ে আপনাদিগের প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি এবং খৃস্টান ধর্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম হয়। অতএব এইক্ষণে আমাদিগের স্ব-স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌণে ইংরেজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবে— তাঁহারদিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাষা হইবেক এবং তাঁহারদিগের ধর্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম হইবেক, সুতরাং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমারদিগের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি....।''

— অক্ষয়কুমার দত্ত।

আর দেবেন্দ্রনাথ নিজে লিখছেন, 'স্বধর্মে থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তন্নিমিত্তেই এই পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। পরমার্থ এবং বৈষয়িক উভয় বিদ্যারই উপদেশ প্রদান করা যাইবে।' (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৭ ভাদ্র ১৭৬৫ শক, পৃঃ ৫-৬)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বেদপ্রচার

সেই সময়ে বঙ্গদেশে বেদ ও উপনিষদের চর্চা প্রায় লুপ্ত হয়েছিল। বাংলার টোলগুলিতে স্মৃতি ও ন্যায়ের অধ্যয়ন হত কিন্তু শ্রুতিশাস্ত্রের চর্চা ও অধ্যয়ন হত না। হিন্দুর মূল শাস্ত্র বেদকে জনপ্রিয় করার তাগিদে দেবেন্দ্রনাথ বেদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ এবং তার পাঠোদ্ধার, অনুবাদ ও চর্চা আরম্ভ করেন। পাণ্ডুলিপি উদ্ধার এবং বেদের অধ্যয়নের জন্য তিনি চারজন ছাত্রকে কাশীতে প্রেরণ করেন এবং তিনি নিজেও সেখানে গিয়ে বেদশ্রবণ ও অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৮৪৮ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঋগ্বেদের মূল সহ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয় এবং ১৮৭১ পর্যন্ত চব্বিশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এক মাসের জন্যও বন্ধ না হয়ে তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই চব্বিশ বছরে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১০৮ সূক্ত পর্যন্ত ১২৪৮টি ঋকের অনুবাদ মুদ্রিত হয়। এই বিরাট কাজ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন, 'একজন পণ্ডিতের সাহায্যে আমি ঋগ্বেদ অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। ঋগ্বেদের পূর্বার্ধ মূল সভায় সংগৃহীত হইয়াছে এবং ভাষ্য যে পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আপাততঃ বেদ-অনুবাদ নির্বাহ হইতে থাকিবে। কিন্তু এ প্রকাণ্ড কাণ্ড। ইহার সংহিতাতেই দশ সহস্রেরও অধিক শ্লোক।' (আত্মজীবনী, পৃঃ ১১২)

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা

হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে মিশনারীদের সমস্ত কুৎসার যুক্তিযুক্ত

Mahavir Institute of Education & Research

Affiliated with I. C. S. E.

17/1, Canal Street, Kolkata - 700 014
Ph. No. 2265-5821/22

A School of UKG to Class - XII
(English Medium)
For Boys & Girls

স্বস্তিকা - পূজা সংখ্যা।। ১৪২১।। ১২৮

ও বিস্তারিত প্রত্যুত্তরের প্রয়োজন বোধ করে দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী রাজনারায়ণ বসু ১৮৭৩ সালে কলকাতার টাউন হলে, 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতা কলকাতার শিক্ষিত সমাজে এতটাই সাড়া ফেলেছিল যে ইংল্যাণ্ডের টাইমস্ পত্রিকাও তার বিস্তৃত প্রতিবেদন মুদ্রিত করে। এই বক্তৃতা সভায় সভাপতিত্ব করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং এই উদ্যোগের পশ্চাতে মহর্ষির প্রেরণার ছাপ স্পষ্ট।

মহর্ষির বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর সাধনজীবন, কর্মজীবন ও বহুরূপী অবদান ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের একজন পথিকৃৎ-রূপে তাঁকে চিহ্নিত করে। সাধক হিসাবে, সাহিত্যরচয়িতা ও লেখক হিসাবে, বিভিন্ন সভা-সমিতির সংস্থাপক হিসাবে, বাংলা ও সংস্কৃতভাষার অনুরাগী হিসাবে, সমাজ সংস্কারক হিসাবে দেবেন্দ্রনাথের বহুমুখী কৃতিত্ব আমাদের অনেকাংশে তাঁর বিশ্ববরেণ্য পুত্রের বহুমুখী প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেবলমাত্র ব্রাহ্ম সমাজের নেতা রূপে নয় বরং বহিরাক্রমণের মুখে ব্রাহ্ম এবং অব্রাহ্ম দু'টি অংশের সমগ্র হিন্দু সমাজের নেতা ও হিন্দুত্বের রক্ষক হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ তৎকালীন হিন্দু সমাজকে জাগরণ, ঐক্য এবং আত্মরক্ষার মন্ত্র শিখিয়েছিলেন।

এমনকী ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরেও কেশব সেনের অনুগামী গোষ্ঠী যখন মূল ব্রাহ্ম আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের অহিন্দু বলতে শুরু করে তখন দেবেন্দ্রনাথ এই প্রবণতার বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁর কাছে ব্রহ্মধর্ম ছিল মূর্তিপূজা বর্জিত উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম, দেশের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কোন পৃথক সম্প্রদায় নয়। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই এই বিভেদকামী প্রবণতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী হিসাবে তিনি বলেন, ''হিন্দুধর্ম অতি প্রশস্ত ও উদার ধর্ম— ইহা সকলপ্রকার উন্নতি আপনার মধ্যে নিবিষ্ট করিতে পারে। অতএব হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া তাহাদের মধ্যে থাকিয়াই ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে হইবে। হিন্দুধর্মকেই উন্নত করিয়া ব্রাহ্মধর্মে পরিণত করিতে হইবে। হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এ দেশের ব্রাহ্মধর্মের প্রচার বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবে না। এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম এখানে স্থান পায় নাই, এই কারণেই মোসলমানেরা সাত শত বৎসর পর্যন্ত তরওয়ারের শাসনেও হিন্দুধর্মকে পরাস্ত করিতে পারে নাই, এজন্যই মায়াবী খৃস্টানরা শত বৎসর পর্যন্ত কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াও তাহাকে মুগ্ধ ও কুণ্ঠিত করিতে পারে নাই।" (ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৩৬)।

মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতির বিকল্প খোঁজা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে স্বদেশী শিক্ষার প্রচলনের জন্য তাঁর অক্লান্ত উদ্যোগ ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ দ্বারা শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাস দেয়। স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্বে

কেশবচন্দ্র সেন

দেবেন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং সেইমত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। অপরদিকে তাঁর উদ্যোগে বঙ্গদেশে এবং বাংলাভাষার হিন্দুর শ্রুতিশাস্ত্র বেদ-বেদান্তের প্রচার ও প্রসার পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের নেতৃত্বে বেদান্ত-আশ্রিত হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান আন্দোলনের মাটি তৈরি করে। ব্রাহ্ম সমাজের নিরাকারবাদী মতাদর্শ ও বিবেকানন্দের অদ্বৈত বেদান্তের মতাদর্শের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টির ব্যাপকতা এবং উদারতার নিরিখে ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু নবজাগরণে উভয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ।

স্বধর্ম ও স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের নিষ্ঠা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখছেন, 'স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোন নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, যে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমাদের পিতৃদেব যখন স্বদেশের প্রচলিত পূজাবিধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখনও তিনি স্বদেশী শাস্ত্রকে ত্যাগ করেন নাই ও স্বদেশী সমাজকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন।"

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও
অভিনন্দন :—

ANU
SAREES